কাব্য-গ্রন্থ।

প্রথম ভাগ

প্রথম খণ্ড।



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন এম্, এ,

সম্পাদক।

প্রকাশক—এস্, সি, মজুমদার।
২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
মজুমদার লাইব্রেরী।

কলিকাতা,—২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্,
ভারত-মিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১০ সন।

কাব্য-গ্রন্থ।

প্রথম ভাগ।

আমারে কর তোমার বীণা,
লহ গো লহ তুলে!
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি
মোহন অঙ্গুলে!
কোমল তব কমল করে
পরশ কর পরাণ পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া
তব শ্রবণমূলে!
কখনো সুখে কখনো দুখে
কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি রবে নীরবে
রহিবে যবে ভুলে!
কেহ না জানে কি নব তানে
উঠিবে গীত শূন্যপানে
আনন্দের বারতা যাবে
অনন্তের কূলে!

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য-গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ ১৩০৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৩ সালের পর কণিকা, কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা ও নৈবেদ্য এই কয়টি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং এতদতিরিক্ত অনেকগুলি কবিতা বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর সমুদয় কবিতাগুলি একত্রে পাইবার ইচ্ছা তাঁহার পাঠকগণের স্বাভাবিক এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

এই সংস্করণে তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত কতকগুলি কবিতা বাদ গিয়াছে এবং যেগুলি ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্য্যে মনোহর ও মর্ম্মস্পর্শী সেগুলিকে রক্ষা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। আদর্শ কবিতার লক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য হইলেও এরূপ কবিতা চিনিয়া লওয়া যে খুব শক্ত তাহা বোধ হয় না। যাহা যথার্থ কবিতা, দিব্য কল্পনা যাহাকে জন্ম দিয়াছে, অকৃত্রিম ছন্দঃসৌন্দর্য্য তাহাকে বাহিরে ভূষিত করে এবং ভাবের গভীরতা তাহাকে অন্তরে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। তাহার আনন্দ কল্যাণকে

আবাহন করে এবং সৌন্দর্য্যে তাহা জগতের নিত্যসুন্দর অনির্ব্বচনীয় পদার্থসমূহের সমতুল হয়। সাধারণভাবে সংক্ষেপে সঙ্কেতস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, যে কবিতা অনির্ব্বচনীয়তায় সঙ্গীতের যত সদৃশ এবং যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসারতা যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ। যিনি কথার সাহায্যে একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যিনি শুধু চিত্রাঙ্কণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহার ছন্দের মর্ম্মে মর্ম্মে সঙ্গীতের অপূর্ব্ব অপরূপ ঝঙ্কারগুলি আনিতে পারেন। যিনি জীবনের একটি সামান্যতম সত্যকে পরিস্ফুট ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যাঁহার কবিতায় সমগ্র জীবনের সুগম্ভীর বিজয়গীতি শ্রুত হয়। যিনি সত্য ও ছন্দের সাহায্যে পাঠকের মনে আনন্দ সৃজন করেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যাঁহার নিজের আনন্দ এত স্বাভাবিক ও যথেষ্ট যে পাঠক কণামাত্র আস্বাদন করিয়া বুঝিতে পারেন, আমি আগন্তুকমাত্র, আমার অপেক্ষা কবির নয়ন অশ্রুতে অধিক সমাকীর্ণ, আমার অপেক্ষা কবির হাস্য আনন্দে অধিক উদ্ভাসিত।

এই খানেই রবীন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব। ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ কবিতা তিনি এত রচনা করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ তাঁহার কাছে অশেষ ঋণে ঋণী। এই সকল কবিতা তাঁহার পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত। শারদ প্রাতে, চৈত্র রজনীতে অথবা "ঘনঘোর

বরষায়," একাকী বা বন্ধুসনে, ইহাদের লইয়া অনেকেই আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন এবং "কখনও সুখে, কখনও দুখে," কখনও আশায়, নৈরাশ্যে, আশঙ্কায়, সংকল্পে, ব্যথায়, উচ্ছ্বাসে, হৃদয়ের সহিত ইহারা যথার্থ আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছে। তবু শঙ্কা হয় যে, কবি সাধারণের নিকট গানের দ্বারা যত পরিচিত, কবিতার দ্বারা তত নন্। এ আশঙ্কা সত্যমূলক হইলে বাস্তবিক দুঃখের কারণ। যাঁহার কবিতা এই দেশের ও সময়ের উপযোগী একটি সুমহান্ সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, সর্ব্ববিধ মঙ্গল অনুষ্ঠানের প্রাণ-স্বরূপ দিব্য কল্পনা যাঁহার কবিতাকে বরণ করিয়াছে, যিনি আমাদের আধুনিক জটিল, কর্ম্মক্লিষ্ট জীবনসমস্যার উপর নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাকে যথার্থভাবে গ্রহণ না করিয়া আমাদের দেশ শুধু নিজের হতভাগ্যতারই পরিচয় দিয়াছে।

রবীন্দ্রবাবুর কবিতা বুঝিতে গেলে কোন কোন পাঠকের পক্ষে কোনও অন্তরায় থাকা সম্ভব, কিন্তু আশা করি তাহা অচিরে দূর হইবে। বর্ত্তমান সংস্করণ তাঁহাদিগকে দুই একটি বিষয়ে সাহায্য করিলেও করিতে পারে। এই সংস্করণে রবীন্দ্রবাবুর কতকগুলি কবিতা এবং কোনও কোনও কবিতার কতক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। পত্রবাহুল্য কখনও কখনও পুষ্পকে পূর্ণসৌন্দর্য্যে প্রকাশিত হইতে দেয় না এবং পুষ্পিত স্তবকে সকল পুষ্পই কিছু সমানভাবে প্রস্ফুটিত হয় না। বাদ দিয়াও যে কবিতা কয়টি

অবশিষ্ট রহিল তাহাদের সংখ্যা ও বিষয়বৈচিত্র্য উভয়ই পাঠকের বিস্ময়ের কারণ হইবে সন্দেহ নাই। বিষয়গুণে যে সকল কবিতা পরস্পর সদৃশ সে গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিতর একত্র করা হইয়াছে।

পাঠকের সুবিধার্থে এখানে শ্রেণী কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

১ম ভাগ (ক)। যাত্রা, হৃদয়ারণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব।

১ম ভাগ (খ)। সোনার তরী, লোকালয়।

২য় ভাগ (ক)। নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক।

২য় ভাগ (খ)। যৌবনস্বপ্ন, প্রেম।

৩য় ভাগ। কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য।

৪র্থ ভাগ। সংকল্প, স্বদেশ।

৫ম ভাগ। রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা।

৬ষ্ঠ ভাগ। মরণ, নৈবেদ্য, জীবনদেবতা, স্মরণ।

৭ম ভাগ। শিশু।

৮ম ভাগ। গান।

৯ম ভাগ (ক)। নাট্য—সতী, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, বিদায়-অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, লক্ষ্মীর পরীক্ষা।

৯ম ভাগ (খ)। নাট্য—প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জ্জন, মালিনী।

৯ম ভাগ (গ)। নাট্য—রাজা ও রাণী।

এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে হয়। সকলেই জানেন কবিতা শ্রেণীভুক্ত করা কত কঠিন। সুন্দর বস্তুকে অবলম্বন করিয়া মনে যে ভাববৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, তাহা সান্ধ্য গগনে বিকশিত বর্ণবৈচিত্র্যের ন্যায়; কোন্ ভাব বা কোন্ বর্ণ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে তাহা বলা সুকঠিন। ভাবের ছন্দোময় প্রকাশ অর্থাৎ কবিতা সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে। বিশেষতঃ রবীন্দ্র বাবুর কবিতা সম্বন্ধে এ কথা বড় খাটে। তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম, তাহার ভিতর বানানো কিছুই নাই, কোন একটা ভাবকে খাড়া করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে রঙ ফলানো নাই, কোন একটি মর‍্যাল বা নৈতিকবিধি শিক্ষা দিবার সজ্ঞান চেষ্টাও নাই। তাঁহার অনেকগুলি কবিতা দেবনিশ্বসিতের ন্যায় অহৈতুকী, "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি" উঠিয়াছে। বুদ্ধি দ্বারা তাহাদের অর্থ ছাঁকিয়া বাহির করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। সোনার তরীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কে? হৃদয়-যমুনায় কাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে? এ সব প্রশ্ন আমরা বৃথা জিজ্ঞাসা করি। অথচ এই দুইটি কবিতাতে হৃদয়ের যে ভাবটি প্রকাশিত তাহা কত পরিষ্কার, যে বেদনা ধ্বনিত হইয়াছে তাহা কত সুস্পষ্ট! কবি যে ভাবময়ী মূর্ত্তিটি সৃজন করিয়াছেন আমরা বিস্মিত ব্যথিত হৃদয়ে তাহার দিকে চাহিয়া থাকি এবং তাহার ভাষার সহিত আমাদের হৃদয়ের ভাষা মিশিয়া যায়। কিন্তু তাহার কি নাম দিব? কোন্

শ্রেণীতে তাহাকে রাখিব ? সহজে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারি না।

এইরূপ কতিপয় কবিতাকে একত্র করিয়া "সোনার তরী" নাম দেওয়া হইয়াছে। সে গুলির সাধারণ লক্ষণ দুইচারিটি কথায় বলিতে চেষ্টা করিব। রবীন্দ্রবাবুর পাঠক মাত্রেই জানেন তাঁহার প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ কত গভীর, তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে কিরূপ মুগ্ধ। এ সম্বন্ধে তিনি একটি অপ্রকাশিত চিঠিতে লিখিয়াছেন * "আমি অনেক বার ভেবে দেখেছি, প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায় সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করে'—এই নিত্য সঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণ লতা তরু গুল্ম, এই জলধারা, এই বায়ু প্রবাহ, এই সতত ছায়ালোকের আবর্ত্তন, এই ঋতু চক্র, এই অনন্ত আকাশপূর্ণ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্য্যায়, এ সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্তচলাচলের যোগ রয়েছে—সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, এই ছন্দের যেখানে যতি পড়ছে যেখানে ঝঙ্কার উঠছে, সেই খানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে—প্রকৃতির সমস্ত অণু পরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে সৌন্দর্য্যে এবং নিগূঢ় একটা আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান

* ২৩এ আগষ্ট, ১৮৯৫।

না থাকৃত, তা হলে কখনই এই বাহ্য জগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘট্‌ত না। যাকে আমরা অন্যায় পূর্ব্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে, নইলে কখনই নির্জীবের প্রতি জীবের, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য্য ভালবাসার বন্ধন থাকৃতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোন জাতিভেদ নেই, সেই জন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি, নইলে আমাদের উভয়ের জন্য দুই ভিন্ন জগত সৃজিত হয়ে উঠ্‌ত। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হবে না, আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি; আমার আর কোন যুক্তি নাই।”

• প্রকৃতির প্রতি কবির অনুরাগ কত গভীর এবং তাহার আত্মীয়তাসুখে তিনি কত সুখী, তাঁহার কাব্য হইতে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। মাকে মা বলিয়া সন্তান যেমন সার্থক হয়, প্রকৃতিকে সুন্দর বলিয়া কবি তেমনি আপনার কবিতাকে সার্থক করিয়াছেন। আমরা “বিশ্ব” খণ্ডের কবিতাগুলিতে কোনও কোনও সুন্দর বস্তুবর্ণনায় এই সার্থকতা দেখিতে পাই। কিন্তু অনির্ব্বচনীয়কে কে বর্ণনা করিবে? এই আলো-আঁধারের স্পন্দনের

সহিত কত ভাব কত সঙ্কেতই হৃদয়ের উপর দিয়া ভাসিয়া যায় তাহাদিগকে কে ধরিয়া রাখিবে? তাহাদিগের মর্ম্ম কিসে পরিস্ফুট হইবে?

আমাদের হাতে শুধু একটি মাত্র জাল আছে যাহাতে প্রকৃতির এই অনির্ব্বচনীয় ক্ষিপ্রগতি ক্ষণিক ভাবগুলিকে ধরিয়া রাখা যায়, তাহা সঙ্গীত। বাস্তবিক ভাষাহীন সঙ্গীতের সুরের ভিতরে কি একটি বেদনা, আনন্দ, আকুলতা বা শান্তি নিহিত থাকে যাহার কাছে বিশ্বের চঞ্চল শোভা ও সৌন্দর্য্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিশ্চল হইয়া যায় এবং মর্ম্মবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু এই নির্ব্বাক সঙ্গীতকে ভাষায় যিনি ব্যক্ত করিতে পারেন তাঁহাকেই প্রকৃত কবি বলিয়া স্বীকার করি এবং সোনারতরী প্রভৃতি কবিতার যদি কোন অর্থ বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে তাহা এই যে, ঘন বর্ষা, ভরানদী, সঞ্চিত ধান, দ্রুত বহমান তরী প্রাণে যে আকুলতা সঞ্চার করে তাহার সহিত মানব হৃদয়ের একটি অতি চিরন্তন ও গভীর বেদনা মিলিত হইয়া একটি অপূর্ব্ব রাগিণী সৃজন করিয়াছে, যে রাগিণীকে একটি চিত্রে অথবা অবস্থাবিন্যাসে পরিণত করা হইয়াছে। "সোনার তরী" শীর্ষক কবিতাগুলির ইহাই বিশেষত্ব।

"লীলা" খণ্ডের কবিতাগুলির ভিতর পাঠক একটি বিশেষ মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রেমের যে সুখ বা দুঃখ তাহার এমন একটি গাম্ভীর্য্য আছে যে তাহা লইয়া লীলা কৌতুক

চলে না। কিন্তু লৌকিক প্রেম অনেক সময় প্রেমের ছায়া মাত্র। কল্পনা করিতে পারি যে এই অবাস্তব ছায়া যথার্থ প্রেমের নিকট তিরস্কারভাজন না হইয়া কৌতুকভাজন হইয়াছে এবং তাহার কৌতুকমিশ্রিত কটাক্ষ দ্বারা লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কৌতুক হাস্যেই লীলার কবিতাগুলি দীপ্তিমান। তাহাদের প্রত্যেকটির ভিতর গভীর অর্থ লুক্কায়িত আছে। কিন্তু—

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই,
হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি তাই
আপন ব্যথাটাই।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"ভালবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে, সঙ্গতকে নহে অসঙ্গতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দরমুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, ছলনাপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালবাসার ধনকে ভালবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেই জন্য সত্যকে সত্য-কথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক

তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়, তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। প্রেমলীলার এই অঙ্গটি এই গ্রন্থাবলীর লীলাখণ্ডে পাঠকেরা পাইবেন। ইহা ছাড়া লীলার মধ্যে আর একটি জিনিষ আছে তাহা বিদ্রোহ। প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আপনাকে বিরূপ মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতেছে। "মাতাল" যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে তাহা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া গায়ের জোরের কথা। বিদ্রোহী অভিমান বলে আমি সমাজসঙ্গত ভব্যতার ধার ধরি না—বিদ্রোহী প্রেম বলে আমি ক্ষণকালের খেলা মাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না,—একান্ত বেদনাকে স্পর্দ্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর। এই সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময়ে ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।"

আর একটি শ্রেণী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেটির নাম "জীবনদেবতা"। এই জীবনদেবতা কে? কাহাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম!

কাহাকে লইয়া তিনি মিলন-উৎসবে মগ্ন এবং কে তাঁহার মুখের

ভাষা কাড়িয়া কথা কহিয়াছেন—"মিলায়ে আপন সুরে" ? ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই এই জীবনদেবতার সহিত বিশ্বদেবতার সৌসাদৃশ্য কল্পনা করিবেন। কিন্তু ইঁহাকে বিশ্বদেব বলিলে কবির আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভোগের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। আমার মনে হয় ফুলফলভারে অবনত কোনও তরু নিজের অন্তর্যামী প্রাণকে সম্বোধন করিয়া কবির ন্যায় প্রশ্ন করিতে পারে—"আমাতে কি এখন তুমি সার্থক হইয়াছে ?" এই প্রাণ অনন্ত প্রাণ নহে ইহা শুধু এই বৃক্ষটিতেই আবদ্ধ। কিন্তু প্রথম হইতে ইহাই বৃক্ষকে অধিকার করিরাছে এবং ক্রমশঃ পত্রপুষ্প-পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া তাহাকে নৈপুণ্যসহকারে গঠিত করিয়া সার্থকতা দিয়াছে। মানব জীবনও এইরূপ দুই ভাগে বিশ্লিষ্ট করা যায়। রবীন্দ্রবাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন "আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া একটি বৃদ্ধি অনুভব করিতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে কিন্তু দুটো এক নয়, এ আমি মাঝে মাঝে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের ক্ষণিক জীবন যে সুখ দুঃখ ভোগ করে, আমাদের চির-জীবন তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করে।"* এই যে দুইটি জীবন ইহার ভিতর কবি প্রণয় কল্পনা করিয়াছেন। একজন সুনিপুণা গৃহিণীর ন্যায় অন্তঃপুরবাসিনী, আর একজন তাঁহার যত কিছু

* অপ্রকাশিত চিঠি—২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

দৈনিক সুখ দুঃখ, সত্য মিথ্যা ধারণা চিন্তা ও ভাব জড় করিয়া আনিতেছেন, অন্তর্যামী প্রকৃতি তাহারি ভিতর হইতে উৎকৃষ্ট এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উপাদান সকল গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু যদিও ইনি গৃহিণী তবু ইহার সহিত কবির যথেষ্ট পরিচয় এখনও হয় নাই। তিনি কতকটা মূঢ়ভাবে ইঁহার অধীন। তাই যখন ইঁহার রাগিণী তাঁহার কবিতায় ধ্বনিত হয়, তিনি অবাক্ হইয়া শুনিতে থাকেন। * সে পরিচয় যে আছে তাহা কি করিয়া বলা যায়? ইনি কত সুন্দর তাহা কি কবি জানেন? ইঁহার বাণীর গভীর অর্থ তিনি কি পরিমাণ করিয়াছেন? ইঁহার আনন্দের উচ্চশিখরে তিনি কি আরোহণ করিয়াছেন? কত যুগযুগান্তর লোকলোকান্তর হইতে ইনি কত বর্ণ ও শব্দ, ভাব ও ভাষা, সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, এবং কত বস্তুর সহিত কি প্রগাঢ় আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন, কবি তাহা ত বলিতে পারেন না! †

* আজ কাল আমার কবিতার প্রশংসা শুনিলে আমার মনে সে রকম একটা পুলক সঞ্চার হয় না। আসল তার কারণ, যে-আমাকে লোকে প্রশংসা করছে, সেই-আমিই যে কবিতা লিখে থাকি, এ আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমি জানি যে সমস্ত ভাল কবিতা আমি লিখেছি, সে আমি ইচ্ছা করলেই লিখতে পারিনে—তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়িতে পারি কি না সন্দেহ।"—অপ্রকাশিত চিঠি, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫।

† এই যে যুগযুগান্তর লোকলোকান্তর হইতে বহমান অনুভূতি ইহা মিথ্যা

তিনি শুধু জানেন যে সময়ে সময়ে আশাতীত সৌভাগ্যের ন্যায় তাঁহার চিত্তে তাঁহার জীবনদেবতার সৌন্দর্য্য প্লাবিত হয় এবং তিনিই বিচিত্ররূপিণী হইয়া তাঁহাকে "সুখের ব্যথায়" উদ্‌ভ্রান্ত করেন! তাঁহাকে তিনি "শত জনমের চির সফলতা" বলিয়াছেন এবং তাঁহারই সহিত অচ্ছেদ্য মিলন কামনা করিয়াছেন।

"গান" ও "শিশু" খণ্ডে কতকগুলি অন্যান্য খণ্ডে প্রকাশিত কবিতা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠক সহজেই ইহার কারণ বুঝিতে পারিবেন।

রবীন্দ্রবাবুর কবিতা সম্বন্ধে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেটি তাঁহার সমুদয় কবিতার অন্তরের কথা এবং কল্পনা নহে, সুদৃঢ় সত্যে প্রতিষ্ঠিত। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে, যদি স্থান ও কালের ধারণা আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিত, তা' হ'লে আমরা কি তাহাদের বিশালত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম? জানি না কোন্ ভূমা প্রজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া এই ক্ষুদ্র পুষ্পের চারিদিকে অসীম স্থান দেখিতেছি এবং বুঝিতে পারিতেছি যে, অনাদি অতীত তাহার সমস্ত শুশ্রূষা দ্বারা পুষ্পটিকে বিকশিত করিয়াছে এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ তাহাকে কোনও না কোনও আকারে রক্ষা করিবে! সৌন্দর্য্য-অনুভবও এইরূপেই হয়। শুক্ তারার জ্যোতি আমাদের মনে ক্ষণিক সুখসঞ্চার করে বলিয়া তাহাকে সুন্দর বলি না, কিন্তু যুগযুগান্তরব্যাপী চিরন্তন মানবহৃদয়কে উহা সংক্ষুব্ধ, আকুলিত বা আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছে বলিয়া উহা সুন্দর। আমরা যখন উহার সৌন্দর্য্য অনুভব করি, বিশাল গভীর মানবহৃদয় আমাদের সহিত সায় দেয় এবং তাহার স্পন্দনগুলি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে।

সেটি ভারতবর্ষেরও কথা। ভারতবর্ষের সাধনা কি? শান্তং শিবমদ্বৈতং। ভারতবর্ষই বলিয়াছেন,—"যোবৈভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" আমরা দেখিতে পাই রবীন্দ্রবাবু যে বিষয়েরই অবতারণা করেন, তাঁহার প্রয়োগ-কৌশলে তাহা আপনার সামান্যতা পরিহার করিয়া সেই ভূমানন্দের অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা সামান্য কথা নহে। কারণ দেখিতে পাই আনন্দকে আনন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন করা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যসুখকে উচ্চতর সুখের বিদ্রোহী করিয়া চিত্রিত করা, প্রতিযোগিতা বিষে কলুষিত করিয়া আনন্দকে কেবলমাত্র একটি জাতি বা দেশের উপভোগ্য করা, সৌন্দর্য্যকে সীমাবদ্ধ করিয়া সৌখীন ক্ষুদ্রতা সৃজন করা, ইত্যাদি আজ কালকার অবনতশীল (বিশেষতঃ ইউরোপীয়) আর্টের একটা খেয়াল দাঁড়াইয়া গেছে। আমাদের কবি তাঁহার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার কাব্যের শিক্ষা আমরা শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতা, মঙ্গল এবং যে আনন্দ চিরন্তন, গভীর ও সার্ব্বজনীন তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারি না। এমন কেহই নাই যিনি তাঁহার কবিতায় মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আর্দ্রচিত্ত, শান্ত, শ্রদ্ধান্বিত ও আনন্দিত হন নাই।

এই যে অদ্বৈতানন্দস্পৃহা তাঁহার কবিতাতে দেখিতে পাই ইহা তাঁহাকে বারম্বার এক আদর্শ লোকে উন্নত করিয়াছে এবং তথাকার সংবাদ দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "প্রতিধ্বনি" ও "উর্ব্বশী"

দুইটি কবিতার উল্লেখ করি। প্রথমটিতে দেখিতে পাই সমুদয় সুন্দর বস্তু অনন্ত আদর্শ সৌন্দর্য্যের প্রতিধ্বনি বা প্রতিবিম্ব বলিয়া সুন্দর হইয়াছে! দ্বিতীয়টি নারী প্রকৃতিকে তাহার সমুদয় মানবীয় সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপটি দেখাইয়াছে। এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল! গল্পে পড়িয়াছিলাম যে এক ব্যক্তি জ্যোতিষ্ক দেখাইতে বর্ত্তিকার সাহায্য লইয়াছিল। এই ভূমিকা লিখিবার সময়ে উক্ত ব্যক্তির সহিত সাদৃশ্য অনুভব করিয়া লজ্জিত ছিলাম। যাহা হউক বর্ত্তমান সংস্করণ কোনও পাঠকের নিকট রবীন্দ্রবাবুর কবিতার অর্থকে সুগম করিলে কৃতার্থ হইব।

—)০(—



কাব্য-গ্রন্থ।

১ম ভাগ, ১ম খণ্ডের সূচী।

যাত্রা।

—o—

হৃদয়-অরণ্য।

নিষ্ক্রমণ।



বিশ্ব।



যাত্রা ।

কেবল তব মুখের পা঳
চাহিয়া,
বাহির হ'নু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া !
অরুণ আজি উঠেছে,
অশোক আজি ফুটেছে,
না যদি উঠে, না যদি ফুটে,
তবুও আমি চলিব ছুটে,
তোমার মুখে চাহিয়া !

নয়নপাতে ডেকেছ মোরে
নীরবে !
হৃদয় মোর নিমেষ মাঝে
উঠেছে ভরি' গরবে !
শঙ্খ তব বাজিল,
সোনার তরী সাজিল,
না যদি বাজে, না যদি সাজে,
গরব যদি টুটে গো লাজে,
চলিব তবু নীরবে।

কথাটি আমি শুধাবনাক
তোমারে !
দাঁড়াবনাক ক্ষণেক তরে
দ্বিধার ভরে দুয়ারে।
বাতাসে পাল ফুলিছে,
পতাকা আজি দুলিছে,
না যদি ফুলে, না যদি দুলে,
তরণী যদি না লাগে কূলে,
শুধাবনাক তোমারে !

যাত্রা ।

"হে পথিক, কোন্‌খানে
চলেছ কাহার পানে ?"

"গিয়েছে রজনী উঠে দিনমণি
চলেছি সাগরস্নানে ।
ঊষার আভাসে তুষার বাতাসে
পাখীর উদার গানে
শয়ন তেয়াগি' উঠিয়াছি জাগি'
চলেছি সাগরস্নানে !"

"শুধাই তোমার কাছে
সে সাগর কোথা আছে ?"

"যেথা এই নদী বহি' নিরবধি
নীল জলে মিশিয়াছে !
সেথা হ'তে রবি উঠে নবছবি
লুকায় তাহারি পাছে,

তপ্ত প্রাণের তীর্থ-স্নানের
সাগর সেথায় আছে!"

"পথিক, তোমার দলে
যাত্রী ক' জন চলে?"

"গণি' তাহা, ভাই, শেষ নাহি পাই,
চলেছে জলে স্থলে!
তাহাদের বাতি জ্বলে সারারাতি
তিমির আকাশতলে!
তাহাদের গান সারা দিনমান
ধ্বনিছে জলে স্থলে!"

"সে সাগর কহ তবে
আর কত দূরে হবে?"

"আর কত দূরে, আর কত দূরে
সেই ত শুধাই সবে!
ধ্বনি তা'র আসে দখিন বাতাসে
ঘন ভৈরব রবে!
কভু ভাবি কাছে, কভু দূরে আছে,
আর কত দূরে হবে?"

"পথিক, গগনে চাহ,
বাড়িছে দিনের দাহ!"

"বাড়ে যদি দুখ হ'ব না বিমুখ,
নিবাব না উৎসাহ!
ওরে ওরে ভীত তৃষিত তাপিত
জয়সঙ্গীত গাহ!
মাথার উপরে খর রবিকরে
বাড়ুক্ দিনের দাহ!"

"কি করিবে চলে' চলে'
পথেই সন্ধ্যা হলে?"

"প্রভাতের আশে স্নিগ্ধ বাতাসে
ঘুমাব পথের কোলে!
উদিবে অরুণ নবীন করুণ
বিহঙ্গ-কলরোলে!
সাগরের স্নান হবে সমাধান
নূতন প্রভাত হলে!"

—o—

পথিক ।

হের ওই হের, প্রভাত এসেছে
স্বর্ণ-বরণ গো !
নিশার ভীষণ প্রাচীর আঁধার
শতধা শতধা করিয়া বিদার—
তরুণ বিজয়ী তপন এসেছে
অরুণ চরণ গো !
ছুটে আয় তবে, ছুটে আয় সবে,
অতি দূর—দূর যাব,
করতালি দিয়া সকলে মিলিয়া
কত শত গান গাব !

কি গান গাইবে ? কি গান গাইব !
যাহা প্রাণ চায় তাহাই গাইব,
গাইব আমরা প্রভাতের গান,
উদয়ের গান,—হৃদয়ের গান,
ছুটে আয় তবে—ছুটে আয় সবে
অতি দূর দূর যাব !

কোথায় যাইবে ? কোথায় যাইব !
জানি না আমরা কোথায় যাইব,

সমুখের পথ যেথা লয়ে যায়!
কুসুম-কাননে, অচল-শিখরে,
নিঝর যেথায় শত ধারে ঝরে,
মণি-মুকুতার বিরল গুহায়—
সুমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়!

দেখ—চেয়ে দেখ পথ ঢাকা আছে
কুসুমরাশিতে রে!
কুসুম দলিয়া—যাইব চলিয়া
হাসিতে হাসিতে রে।
ফুলে কাঁটা আছে! কই! কাঁটা কই!
কাঁটা নাই—নাই—নাই—
এমন মধুর কুসুমেতে কাঁটা
কেমনে থাকিবে ভাই!
যদিও বা ফুলে কাঁটা থাকে ভুলে
তাহাতে কিসের ভয়!
ফুলেরি উপরে ফেলিব চরণ,
কাঁটার উপরে নয়।
আমাদের কভু হবে না বিরহ,
এক সাথে মোরা র'ব অহরহ,

হয় ত যাইব কুসুম-কাননে,
হয় ত যাইব না ;
হয় ত পাইব পূর্ণ জলাশয়,
হয় ত পাইব না।
এ দূর পথের অতি শেষ সীমা
হয় ত দেখিতে পাব—
হয় ত পাব না, ভুলি যদি পথ
কে জানে কোথায় যাব !
দিন যায় চলে, সন্ধ্যা হ'ল বলে,
অধিক সময় নাই,
বহু দূর পথ রহিয়াছে বাকী,
চল ত্বরা করে যাই।"
"ও পথে যাব না, মিছা সব আশা,
হইব উত্তরগামী।"
"দক্ষিণে যাইব", "পশ্চিমে যাইব",
"পূরবে যাইব আমি।"
"যে যাইবে যাও, যে আসিবে এস,
চল ত্বরা করে যাই।
দিন যায় চলে, সন্ধ্যা হ'ল বলে,
অধিক সময় নাই।"

হৃদয়-অরণ্য ।

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—
কাঁদিছে আপন মনে,—
কুসুমের দলে বন্ধ হয়ে
করুণ কাতর স্বনে
কহিছে সে—হায় হায়,
বেলা যায় বেলা যায় গো
ফাগুনের বেলা যায় !
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা !
কুসুম ফুটিবে, বাঁধন টুটিবে,
পূরিবে সকল কামনা !
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই
ফাগুন তখনো যাবে না !

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে
ফিরিছে আপন মাঝে,
বাহিরিতে চায় আকুলশ্বাসে
কি জানি কিসের কাজে।
কহিছে সে—হায় হায়,
কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
না জানিয়া দিন যায়।।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।

দখিন-পবন দ্বারে দিয়া কান
জেনেছে রে তোর কামনা।
আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চলে যাবে না।

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে—
ভাবিছে উদাসপারা,—
জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থ-হারা!
কহিছে সে—হায় হায়,
কেন আমি বাঁচি, কেন আছি গো
অর্থ না বুঝা যায়!
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা!
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পূরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি!
জনম ব্যর্থ যাবে না!

—০—

হৃদয়-অরণ্য।



সন্ধ্যা।

অয়ি সন্ধ্যে,
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,
কেশ এলাইয়া,
নত করি স্নেহময় মোহময় মুখ
জগতেরে কোলেতে লইয়া,
মৃদু মৃদু ও কি কথা কহিস্ আপন মনে
মৃদু মৃদু গান গেয়ে গেয়ে,
জগতের মুখ পানে চেয়ে!

প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর ওই কথা
নারিনু বুঝিতে!
প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর ওই গান
নারিনু শিখিতে!

হৃদয়ের অতি দূর—দূর—দূরান্তরে
মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে
কে জানে রে কোথাকার উদাসী প্রবাসী যেন
তোর সাথে তোরি গান করে।
অয়ি সন্ধ্যা, তোরি যেন স্বদেশের প্রতিবেশী
তোরি যেন আপনার ভাই
প্রাণের প্রবাসে মোর দিশা হারাইয়া
কেঁদে কেঁদে বেড়ায় সদাই!
কত না পুরাণ কথা, কত না হারাণ' গান,
কত না প্রাণের দীর্ঘশ্বাস,
সরমের আধ হাসি সোহাগের আধ বাণী
প্রণয়ের আধ মৃদু ভাষ
সন্ধ্যা, তোর ওই অন্ধকারে
হারাইয়া গেছে একেবারে!
যবে এই নদীতীরে বসি তোর পদতলে,
তারা সবে দলে দলে আসে
প্রাণেরে ঘেরিয়া চারি পাশে।
হয় ত একটি ছায়া, একটি মুখের ছায়া
আমার মুখের পানে চায়,
চাহিয়া নীরবে চলে যায়!

আজি আসিয়াছি সন্ধ্যা,—বসি তোর অন্ধকারে
মুদিয়া নয়ান,
সাধ গেছে গাহিবারে—মৃদুস্বরে শুনাবারে
দু চারিটি গান।
সে গান না শোনে কেহ যদি,
যদি তারা হারাইয়া যায়,
সন্ধ্যা, তুই সযতনে গোপনে বিজনে অতি
ঢেকে দিস্ আঁধারের ছায়।
যেথায় পুরাণ গান যেথায় হারান' হাসি,
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন,
সেইখানে সযতনে রেখে দিস্ গানগুলি
রচে দিস্ সমাধি-শয়ন!

—০—

আবাহন।

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার,
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে, কবিতা আমার।

যবে আমি আসিব হেথায়
মন্ত্র পড়ি ডাকিব তোমায়।

বাতাসে উড়িবে তোর বাস,
ছড়ায়ে পড়িবে কেশপাশ,
গলাটি জড়ায়ে ধরি মোর
বসে' র'বি কোলের উপর।
এলোথেলো কেশপাশ লয়ে
বসে বসে খেলিব হেথায়,
ঊষার অলক দুলাইয়া
সমীরণ যেমন খেলায়!
চুমিয়া চুমিয়া ফুটাইব
আধ-ফুটো হাসির কুসুম,
মুখ লয়ে বুকের মাঝারে
গান গেয়ে পাড়াইব ঘুম!

মেঘ হতে নেমে ধীরে ধীরে
আয় লো কবিতা মোর বামে
চম্পক অঙ্গুলি দুটি দিয়ে
অন্ধকার ধীরে সরাইয়ে,
ঊষসী যেমন করে' নামে।
হৃদয়ের অন্তঃপুর হতে
বধূ মোর, ধীরে ধীরে আয়!

ভীরু প্রেম যেমন করিয়া
ধীরে উঠে হৃদয় ধরিয়া,
বঁধুর পায়ের কাছে গিয়ে
অমনি মূরছি পড়ে যায় !

অথবা শিথিলকলেবরে
এস তুমি, বস' মোর পাশে
শোয়াইয়া তুষার-শয়নে,
চুমি চুমি মুদিত নয়নে,
মরণ যেমন করে আসে,
শিশির যেমন করে ঝরে ;
পশ্চিমের আঁধার সাগরে
তারাটি যেমন করে যায় ;
তেমনি, তেমনি করে এস,
কবিতা রে, বধূটি আমার,
ম্লানমুখে করুণা বসিয়া,
চোখে ধীরে ঝরে অশ্রুধার ।
দুটি শুধু বাহিরিবে বাণী,
মরমে রাখিবি মুখখানি !

তারকার আত্মহত্যা।

জ্যোতির্ম্ময় তীর হ'তে আঁধার সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা!
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক্ হইয়া—
এই যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্ত্তে সে গেল মিশাইয়া!
যে সমুদ্র-তলে
মনোদুঃখে আত্মঘাতী,
চির-নির্ব্বাপিত-ভাতি—
শত মৃত তারকার
মৃত দেহ রয়েছে শয়ান,
সেথায় সে করেছে পয়ান!

কেন গো কি হয়েছিল তার?
একবার শুধালে না কেহ?
কি লাগি সে তেয়াগিল দেহ?
যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কি যে সে কহিত!

যত দিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কি তারে দহিত!
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না!
হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত—দহিত তারে—দহিত কেবল!
জ্যোতির্ম্ময় তারা-পূর্ণ বিজন তেয়াগি
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে
আঁধারের তারা হীন বিজনের লাগি!

তবে গো তোমরা কেন সহস্র সহস্র তারা
উপহাস করি তারে হাসিছ অমন ধারা?
কহিতেছ—"আমাদের কি হয়েছে ক্ষতি?
যেমন আছিল আগে তেমনি র'য়েছে জ্যোতি।"
হেন কথা বলিও না আর!
সে কি কভু ভেবেছিল মনে—
(এত গর্ব্ব আছিল কি তার?)
আপনারে নিভাইয়া তোমাদের করিবে আঁধার?

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,
আঁধার সাগরে—
গভীর নিশীথে,
অতল আকাশে!
হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কিরে যায় তোর
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে?
ওই আঁধার সাগরে!
এই গভীর নিশীথে!
ওই অতল আকাশে!

—০—

আশার নৈরাশ্য।

ওরে আশা, কেন তোর হেন দীন বেশ?
নিরাশারি মত যেন বিষণ্ণ বদন কেন?
যেন অতি সঙ্গোপনে,
যেন অতি সন্তর্পণে
অতি ভয়ে ভয়ে প্রাণে করিস্ প্রবেশ!

আজ আসিয়াছ দিতে যে সুখ-আশ্বাস,
নিজে তাহা কর না বিশ্বাস!

তাই মুখ ম্লান অতি, তাই হেন মৃদু গতি,
তাই উঠিতেছে ধীরে দুখের নিশ্বাস !
বসিয়া মরম-স্থলে কহিছ চখের জলে—
"বুঝি, হেন দিন রহিবে না !
আজ যাবে, কাল ত আসিবে,
দুঃখ যাবে, ঘুচিবে যাতনা !"
কেন, আশা, মোরে কেন হেন প্রতারণা ?
দুঃখক্লেশে আমি কি ডরাই ?
আমি কি তাদের চিনি নাই ?
তারা সবে আমারি কি নয় ?
তবে, আশা কেন এত ভয় ?
তবে কেন বসি মোর পাশ
মোরে, আশা, দিতেছ আশ্বাস ?

সুখের বিলাপ।

অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া-
এমন মধুর রজনীতে
একেলা রয়েছি বসিয়া,

যামিনীর হৃদয় হইতে
জোছনা পড়িছে খসিয়া ।
হৃদয়ে একেলা শুয়ে শুয়ে
সুখ শুধু এই গান গায়,—
"নিতান্ত একেলা আমি যে
কেহ—কেহ—কেহ নাই হায় !"

আমি তারে শুধাইনু গিয়া,—
"কেন, সুখ, কার কর আশা ?"
সুখ শুধু কাঁদিয়া কহিল,—
ভালবাসা, ভালবাসা গো !

সুখ বলে,—"এ জন্ম ঘুচায়ে
সাধ যায় হইতে বিষাদ ।"
"কেন সুখ, কেন হেন সাধ !"
"নিতান্ত একা যে আমি গো—
কেহ যে—কেহ যে নাই মোর !"
"সুখ কারে চায় প্রাণ তোর ?
সুখ, কার করিস্ রে আশা ?"
সুখ শুধু কেঁদে কেঁদে বলে,—
"ভালবাসা—ভালবাসা গো !"

আবার।

তুমি কেন আইলে হেথায়
এ আমার সাধের আবাসে ?
এ আলয়ে যে নিবাসী থাকে,
এ আলয়ে যে অতিথি আসে,
সবাই আমার সখা, সবাই আমার বঁধু,
সবারেই আমি ভালবাসি,
তারাও আমারে ভালবাসে,
তুমি তবে কেন এলে হেথা
এ আমার সাধের আবাসে ?
কেহ হেথা নাইক নিষ্ঠুর,
কিছু হেথা নাইক কঠিন,
কবিতা আমার প্রণয়িনী
এইখানে আসে প্রতিদিন !
আকাশেতে তুলে আঁখি বাতায়নে বসে থাকি
নিশি যবে পোহায় পোহায় ;
ঊষার আলোকে হারা সখী মোর শুকতারা
আমার এ মুখ পানে চায়।
ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
প্রতি দিন আসে মোর পাশ।

দেখে, আমি বাতায়নে, অশ্রু ঝরে দু নয়নে,
ফেলিতেছি দুখের নিশ্বাস !
যে কেহ আমার ঘরে আসে
সবাই আমারে ভালবাসে,
তবে কেন তুমি এলে হেথা,
এ আমার সাধের আবাসে !

এমনি হয়েছে শান্ত মন,
ঘুচেছে দুঃখের কঠোরতা ;
ভাল লাগে বিহঙ্গের গান,
ভাল লাগে তটিনীর কথা।
ভাল লাগে কাননে দেখিতে
বসন্তের কুসুমের মেলা,
ভাল লাগে, সারাদিন বসে
দেখিতে মেঘের ছেলেখেলা।

যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিও না—নিও না কেড়ে,
নিও না, নিও না মন মোর ;
সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিও না মোরে,
ছিঁড়ো না এ প্রণয়ের ডোর !

কাল সবে গড়েছি আলয়,
কাল সবে জুড়েছি হৃদয়,
আজি তা' দিও না যেন ভেঙে
রাখ' তুমি রাখ' এ বিনয়!

পরাজয়-সঙ্গীত।

ভাল করে বুঝিলিনে, হ'ল তোরি পরাজয়,
কি আর ভাবিতেছিস্, ম্রিয়মাণ, হা হৃদয়!
কাঁদ তুই, কাঁদ, হেথা আয়,
একা বসে বিজনে বিদেশে!
জানিতাম জানিতাম হা—রে
এমনি ঘটিবে অবশেষে!

সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হল,
তোরি শুধু হল পরাজয়,
প্রতি রণে প্রতি পদে একে একে ছেড়ে দিলি
জীবনের রাজ্য সমুদয়।
যতবার প্রতিজ্ঞা করিলি
ততবার পড়িল টুটিয়া,
ছিন্ন আশা বাঁধিয়া তুলিলি
বার বার পড়িল লুটিয়া

মনে হইতেছে আজি, জীবন হারায়ে গেছে
মরণ হারায়ে গেছে হায়,
কে জানে একি এ ভাব ? শূন্যপানে চেয়ে আছি
মৃত্যুহীন মরণের প্রায় !
পরাজিত এ হৃদয়, জীবনের দুর্গ মম
মরণে করিল সমর্পণ
তাই আজ জীবনে মরণ !

জাগ্, জাগ্, জাগ্ ওরে, গ্রাসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া,
আকাশ-গরাসী তার কায়া।
গেল তোর চন্দ্র সূর্য্য, গেল তোর গ্রহ তারা,
গেল তোর আত্ম আর পর,
এই বেলা প্রাণপণ কর !
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিস্‌নে আর !
যাহা পাস্ আঁকড়িয়া ধর্
সম্মুখে অসীম পারাবার।
সম্মুখেতে চির অমানিশি,
সম্মুখেতে মরণ বিনাশ !

গেল, গেল বুঝি নিয়ে গেল,
আবর্ত্ত করিল বুঝি গ্রাস।

—০—

শিশির।

শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে,
"কেন মোর হেন ক্ষুদ্র প্রাণ?
শিশুটির কল্পনার মত
জনমি অমনি অবসান?"
"আমি কেন হইনি শিশির?"
কহে কবি নিশ্বাস ফেলিয়া,
"প্রভাতেই যেতেম শুকায়ে
প্রভাতেই নয়ন মেলিয়া!"

সংগ্রাম-সংগীত।

এত দিন কিছু না করিনু,
এত দিন বসে রহিলাম,
হৃদয়ের সাথে আজি
করিব রে—করিব সংগ্রাম!

বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার
জগৎ করিছে ছারখার !
গ্রাসিছে চাঁদের কায়া ফেলিয়া আঁধার ছায়া
সুবিশাল রাহুর আকার !
মেলিয়া আঁধার গ্রাস দিনেরে দিতেছে ত্রাস,
মলিন করিছে মুখ তার ।

মিছা বসে রহিব না আর
চরাচর হারায় আমার ।
রাজ্যহারা ভিখারীর সাজে,
দগ্ধ-ধ্বংস-ভস্ম-পরি ভ্রমিব কি হাহা করি
জগতের মরুভূমি মাঝে ?

আজ তবে হৃদয়েরি সাথে
একবার করিব সংগ্রাম !
ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম !
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর ঊষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা ।

ফিরে নেব হারান সঙ্গীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন!
আমি হব সংগ্রামে বিজয়ী,
হৃদয়ের হবে পরাজয়!
জগতের দূর হবে ভয়
চারি দিকে দিবে হুলুধ্বনি,
বরষিবে কুসুম-আসার,
বেঁধে দেব বিজয়ের মালা
শান্তিময় ললাটে আমার!

পথভ্রষ্ট।

কে গো সেই, কে গো হায় হায়,
জীবনের তরুণ বেলায়
খেলাইত হৃদয়-মাঝারে
দুলিত রে অরুণ-দোলায়?
সচেতন অরুণ কিরণ
কে সে প্রাণে এসেছিল নামি?

সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
সে আমার সুকুমার আমি !

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথমাঝে উড়িল রে ধূলি,
হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে
দু জনে আইনু পথ ভুলি ।
কেঁদে সে কহিল মুখ চাহি,
"ওগো মোরে আনিলে কোথায় ?
পা'য় পা'য় বাজিতেছে বাধা,
তরু-শাখা লাগিছে মাথায় ।
চারি দিকে মলিন আঁধার,
কিছু হেথা নাহি যে সুন্দর,
কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাত রবিকর ?"
কেঁদে কেঁদে সাথে সে চলিল,
কহিল সে সকরুণ স্বর,
"কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাত রবি-কর !"

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথ হ'ল পাঙ্কিল, মলিন,
মুখে তার কথাটিও নাই,
দেহ তার হ'ল বলহীন।
অবশেষে একদিন, কেমনে, কোথায়, কবে,
কিছুই যে জানিনে গো হায়,
হারাইয়া গেল সে কোথায়!

বহু দিন দেখি নাই তারে,
আসেনি এ হৃদয় মাঝারে।
মনে করি মনে আনি তার সেই মুখখানি,
ভাল করে মনে পড়িছে না,
হৃদয়ে যে ছবি ছিল, ধূলায় মলিন হল,
আর তাহা নাহি যায় চেনা!
ভুলে গেছি কি খেলা খেলিত,
ভুলে গেছি কি কথা বলিত!
যে গান গাহিত সদা, সুর তার মনে আছে,
কথা তার নাহি পড়ে মনে!
যে আশা হৃদয়ে লয়ে উড়িত সে মেঘ চেয়ে,
আর তাহা পড়ে না স্মরণে!

শুধু যবে হৃদি মাঝে চাই
মনে পড়ে—কি ছিল, কি নাই!

নিশীথ-জগৎ।

জন্মেছি নিশীথে আমি, তারার আলোকে
রয়েছি বসিয়া।
চার দিকে নিশীথিনী মাঝে মাঝে হুহু করি
উঠিছে শ্বসিয়া।
আঁধারের প্রাণী যত ভূমিতলে হাত দিয়া
ঘুরিয়া বেড়ায়,
চোখে উড়ে পড়ে ধূলা, কোন্‌খানে কি যে আছে
দেখিতে না পায়।
নড়িলে গাছের পাতা চকিতে চমকি উঠে,
চায় চারি ধারে!
ঘোর আঁধারের মাঝে কোথা কি লুকায়ে আছে
কে বলিতে পারে!

সহসা সমুখ দিয়া কে গেল ছায়ার মত,
লাগিল তরাস!

কে জানে সহসা যেন　　কোথা কোন্ দিক হতে
শুনি দীর্ঘশ্বাস!
কে বসে রয়েছে পাশে?　　কে ছুঁইল দেহ মোর
হিম-হস্তে তার?
ও কি ও? এ কি রে শুনি!　কোথা হতে উঠিল রে
ঘোর হাহাকার?
ও কি হোথা দেখা যায়—　　ওই দূরে—অতি দূরে
ও কিসের আলো?
ও কি ও উড়িছে শূন্যে?　　দীর্ঘ নিশাচর পাখী?
মেঘ কালো কালো?

অরণ্যের প্রান্তভাগে　　নদী এক চলিয়াছে
বাঁকিয়া বাঁকিয়া,
স্তব্ধ জল, শব্দ নাই—　　ফণী সম ফুঁসি উঠে
থাকিয়া থাকিয়া!
আঁধারে চলিতে পান্থ　　দেখিতে না পায় কিছু
জলে গিয়া পড়ে,
মুহূর্ত্তের হাহাকার—　　মুহূর্ত্তে ভাসিয়া যায়
খর-স্রোত-ভরে।

সখা তার তীরে বসি একেলা কাঁদিতে থাকে,
ডাকে ঊর্দ্ধশ্বাসে,
কাহারো না পেয়ে সাড়া শূন্যপ্রাণ প্রতিধ্বনি
কেঁদে ফিরে আসে!

মাঝে মাঝে থেকে থেকে কোথা হতে ভেসে আসে
ফুলের সুবাস,
প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে, অশ্রুজলে ভাসে আঁখি
উঠে রে নিশ্বাস!
চারি দিক ভুলে যাই, প্রাণে যেন জেগে ওঠে
স্বপন-আবেশ,—
কোথা রে ফুটেছে ফুল আঁধারের কোন্ তীরে!
কোথা কোন্ দেশ!

নিদ্রাহীন আঁখি মেলি পূরব আকাশ পানে
রয়েছি চাহিয়া,
কবে রে প্রভাত হবে, আনন্দে বিহঙ্গগুলি
উঠিবে গাহিয়া!
ওই যে পূরবে হেরি অরুণ-কিরণে সাজে
মেঘ-মরীচিকা।

নারে না কিছুই নয়— পূরব শ্মশানে উঠে
চিতানল-শিখা !

—০—

হৃদয়ের ভাষা।

হৃদয়, কেন গো মোরে ছলিছ সতত,
আপনার ভাষা তুমি শিখাও আমায় !
প্রত্যহ আকুল কণ্ঠে গাহিতেছি কত,
ভগ্ন বাঁশরীতে শ্বাস করে হায় হায় !
সন্ধ্যাকালে নেমে যায় নীরব তপন
সুনীল আকাশ হতে সুনীল সাগরে ;
আমার মনের কথা, প্রাণের স্বপন
ভাসিয়া উঠিছে যেন আকাশের পরে।
ধ্বনিছে সন্ধ্যার মাঝে কার শান্ত বাণী,
ও কি রে আমারি গান ? ভাবিতেছি তাই !
প্রাণের যে কথাগুলি আমি নাহি জানি,
সে কথা কেমন করে জেনেছে সবাই !
মোর হৃদয়ের গান সকলেই গায়,
গাহিতে পারিনে তাহা আমি শুধু হায় !

—০—

নিষ্ক্রমণ।

আঁধার আসিতে রজনীর দীপ
জ্বেলেছিনু যতগুলি—
নিবাও, রে মন, আজি সে নিবাও
সকল দুয়ার খুলি !

আজি মোর ঘরে জানি না কখন
প্রভাত করেছে রবির কিরণ,
মাটির প্রদীপে নাই প্রয়োজন,
ধূলায় হোক্ সে ধূলি !

নিবাও, রে মন, রজনীর দীপ
সকল দুয়ার খুলি !

রাখ রাখ আজ তুলিয়ো না সুর
ছিন্ন বীণার তারে !
নীরবে, রে মন, দাঁড়াও আসিয়া
আপন বাহির-দ্বারে !

শুন আজি প্রাতে সকল আকাশ
সকল আলোক সকল বাতাস
তোমার হইয়া গাহে সঙ্গীত
বিরাট কণ্ঠ তুলি' !

নিবাও নিবাও রজনীর দীপ
সকল দুয়ার খুলি' !

নিষ্ক্রমণ।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
(ওরে) উথলি উঠেছে বারি,
(ওরে) প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি!
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে!

মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগত-মাঝারে লুটিতে চায়!
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন?
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্!
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর!

আমি—ঢালিব করুণা-ধারা!
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা!
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,

রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিব রে পরাণ ঢালি !
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
নব নব দেশে বারতা লইয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব' প্রাণ ব'হে যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর !
মেঘগরজনে বরষা আসিবে,
মদির-নয়নে বসন্ত হাসিবে,
বিশদ-বসনে শিশির-মালা

আসিবে হাসিবে শরত-বালা।
কূলে কূলে মোর উছলি জল,
কুলু কুলু ধোবে চরণতল।
কূলে কূলে মোর ফুটিবে হাসি,
বিকশিত কাশ-কুসুম-রাশি।
দূরে দূরে কভু বাজিবে বাঁশি।
মূরছি পড়িবে মলয় বায়!
তুরু তুরু মোর দুলিবে হিয়া
শিহরিয়া মোর উঠিবে কায়।
এত সুখ কোথা, এত রূপ কোথা,
এত খেলা কোথা আছে,
যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে!

(ওরে) অগাধ বাসনা, অসীম আশা,
জগৎ দেখিতে চাই!
জাগিয়াছে সাধ— চরাচরময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই!
যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,

যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই,
পরাণের সাধ তাই!

কি জানি কি হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান!
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন!
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন!
ওই যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়,
"কে আসিবি, কে আসিবি, কে তোরা আসিবি আয়!
পাষাণবাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা!"
আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণা-গান;
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।

ওরে চারিদিকে মোর,
এ কি কারাগার ঘোর!
ভাঙ্গ্‌ ভাঙ্গ্‌ ভাঙ্গ্‌ কারা, আঘাতে আঘাত কর!
(ওরে আজ) কি গান গেয়েছে পাখী,
এয়েছে রবির কর।

—০—

প্রভাত-উৎসব।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মম হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা-সখী বসিয়া চোখোচোখী
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি!
এসেছে ভাই বোন, পুলকে-ভরা মন,
ডাকিছে "ভাই ভাই" আঁখিতে আঁখি তুলি
পুলকে পুরে প্রাণ শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর!
এসেছে রবিশশী এসেছে কোটি তারা
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা!

পরাণ পূরে গেল, হরষে হল ভোর,
কোথাও কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর!

প্রভাত হল যেই, কি জানি হল এ কি!
আকাশপানে চাই, কি জানি কারে দেখি,
প্রভাত-বায়ু বহে কি জানি কি যে কহে,
মরমমাঝে মোর কি জানি কি যে হয়!
এস হে এস কাছে সখা হে এস কাছে—
এস হে ভাই এস, বস হে প্রাণ-ময়!
পূরব-মেঘ-মুখে পড়েছে রবি-রেখা,
অরুণ-রথ-চূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব,
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব!
মধুর মধু আলো মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বহে যায়;
যে দিকে আঁখি চায় সে দিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে,
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।

কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসো না তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখ আমার মুখ পানে,
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে।
আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে,
অরুণ কর দিয়ে মুকুট দেন শিরে,
নিজের গলা হতে কিরণ-মালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি পরে,
আপনা বলে জানি জগত চরাচরে।

—০—

অনন্ত-জীবন।

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ,
জনমেছি দু দিনের তরে,
যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে
গান গাই আনন্দের ভরে!
এ আমার গানগুলি দুদণ্ডের গান,
রবে না রবে না চির দিন,
পূরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন!

তা' ব'লে নয়নে কেন উঠে অশ্রুজল—
কেন তোর দুখের নিশ্বাস,
গীত গান বন্ধ করে রয়েছিস্ বসে
কেন ওরে হৃদয় হতাশ ?
আনন্দের প্রাণ তোর, আনন্দের গান,
সাঙ্গ তাহা করিস্‌নে আজ—
যখন যা মনে হবে উঠিবি গাহিয়া
এই শুধু—এই তোর কাজ !

কাল গান ফুরাইবে, তা বলে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত ?
আজ যবে জ্বলিছে শিশির,
আজ যবে কুসুমকাননে
বহিয়াছে বিমল সমীর !

তোরা ফুল, তোরা পাখী, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দ-লহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,

কখন্ উঠিলি আর কখন মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ!
কত শত উঠিতেছে, যেতেছে টুটিয়া
কে বল' রাখিবে তাহা মনে;
তা ব'লে কি সাধ যায় লুকাইতে প্রাণ
সূর্য্যহীন আঁধার মরণে?
যা হবে, তা হবে মোর, কিসের ভাবনা!
রাখি শুধু মুহূর্ত্তের আশ,
একটি তরঙ্গ হয়ে আনন্দ-সাগরে
মুহূর্ত্তেই পাইব বিনাশ।
মুহূর্ত্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
জান না ত কোথায় তা যায়,
আকাশের সাগর-সীমায়।
আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
গীত-রাজ্য হতেছে সৃজন,
যত গান উঠিতেছে ধরার গগনে
সেইখানে করিছে গমন।

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,

চারি দিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
পৃথ্বী হতে মহাস্রোত ছুটিতেছে নিশিদিন
সেই মহা-সাগর উদ্দেশে;
আমরা মাটীর কণা জলস্রোত ঘোলা করি
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে,
সাগরে পড়িব অবশেষে!
জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ;
কে জানে হবে কি তাহা শেষ?

তাই বলি প্রাণ ওরে—মরণের ভয় ক'রে
কেন রে আছিস্ ম্রিয়মাণ
সমাপ্ত করিয়া গীত গান।
গান গা' পাখীর মত, ফোট রে ফুলের প্রায়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
তুই যাবি, গান যাবে, এক সাথে ভেসে যাবে
তুই, আর তোর গানগুলি!
মিশিবি সে সিন্ধুজলে অনন্ত সাগরতলে,

এক সাথে শুয়ে র'বি প্রাণ,
তুই, আর তোর এই গান!

পুনর্মিলন।

ও গো সেই ছেলেবেলা,—আনন্দে করেছি খেলা,
প্রকৃতি গো—জননি গো—কেবলি তোমারি কোলে!
তার পরে কি যে হল—কোথা যে গেলেম চলে!
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথহারা!
সে বন আঁধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।
নাহি রবি নাহি শশী, নাহি গ্রহ, নাহি তারা,
কে জানে কোথায় দিগ্বিদিক!
আমি শুধু একেলা পথিক!
তোমারে গেলেম ফেলে, অরণ্যে গেলেম চলে,
কাটালেম কত শত দিন,
ম্রিয়মাণ—সুখশান্তিহীন!

আজিকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে।
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।
দেখিনু ফুটিছে ফুল, দেখিনু উড়িছে পাখী,
আকাশ পূরেছে কলস্বরে!
জীবনের ঢেউগুলি ওঠে পড়ে চারি দিকে,
রবিকর নাচে তার পরে।
চারি দিকে বহে বায়ু, চারি দিকে ফুটে আলো,
চারি দিকে অনন্ত আকাশ,
চারি দিক পানে চাই, চারি দিকে প্রাণ ধায়,
জগতের অসীম বিকাশ!
কেহ এসে বসে কোলে, কেহ ডাকে সখা বোলে,
কাছে এসে কেহ করে খেলা,
কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ আসে, কেহ যায়,
এ কি হেরি আনন্দের মেলা!

বুঝেছি গো বুঝেছি গো— এত দিন পরে বুঝি
ফিরে পেলে হারান' সন্তান!
তাই বুঝি দুই হাতে জড়ায়ে লয়েছ বুকে,
তাই বুঝি গাহিতেছ গান।

তাই বুঝি ছুটে আসে সমীরণ মোর পাশে,
বারবার করে আলিঙ্গন,
আকাশ আনন্দভরে আমার মাথার পরে
করিছে প্রভাত বরিষণ !
তাই বুঝি মেঘমালা পূরব দুয়ার হতে
স্নেহ দৃষ্টে মোর মুখে চায়।
তাই বুঝি চরাচর তাহার বুকের মাঝে
বারবার ডাকিছে আমায়।

—০—

স্রোত।

জগৎ-স্রোতে ভেসে চল, যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবি শশী চল রে সেথা যাই !
কোথায় চলে কে জানে তা', কোথায় যাবে শেষে !
জগৎ-স্রোত বহে গিয়ে কোন্ সাগরে মেশে !
অনাদি কাল চলে স্রোত অসীম আকাশেতে,
উঠেছে মহা কলরব অসীমে যেতে যেতে।
উঠিছে ঢেউ, পড়ে ঢেউ, গণিবে কেবা কত !
ভাসিছে শত গ্রহ তারা, ডুবিছে শত শত !
শতেক কোটি গ্রহতারা যে স্রোতে তৃণ প্রায়,
সে স্রোত মাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়

দেখিব চেয়ে চারি দিকে, দেখিব তুলি মুখ,
কত না আশা, কত হাসি, কত না সুখ দুখ,
বিরাগ দ্বেষ ভালবাসা, কত না হায় হায়,
তপন ভাসে, তারা ভাসে, তা'রাও ভেসে যায়!
কত না যায়, কত চায়, কত না কাঁদে হাসে,
আমি ত শুধু ভেসে যাব দেখিব চারি পাশে!
অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস্ আমি, আমি!
উজানে যেতে পারিবি কি সাগর-পথ-গামি!
জগত-পানে যাবিনেরে, আপনা পানে যাবি;
সে যে রে মহা মরুভূমি কি জানি কি যে পাবি!
মাথায় করে আপনারি, সুখদুখের বোঝা,
ভাসিতে চাস্ প্রতিকূলে সে ত রে নহে সোজা!
অবশ দেহ, ক্ষীণ বল, সঘনে বহে শ্বাস!
লইয়া তোর সুখ দুখ এখনি পাবি নাশ!

জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না!
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।
আমার নাহি সুখ দুখ পরের পানে চাই
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হ'য়ে যাই

তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে,
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে।
প্রভাত সাথে মুদি আঁখি, সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই।
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি!
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি, সুখীর সাথে গাই;
সবার সাথে আছি আমি, আমার সাথে নাই,
জগৎস্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই!

—০—

প্রতিধ্বনি।

অয়ি প্রতিধ্বনি!
বুঝি আমি তোরে ভালবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না,
আমারে করিলি তুই আকুল ব্যাকুল,
তোর লাগি কাঁদে মোর বীণা!
তোর মুখে পাখীদের শুনিয়া সঙ্গীত,
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,

গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান,
বালকের মধুমাখা স্বর,
তোর মুখে জগতের সঙ্গীত শুনিয়া,
তোরে আমি ভালবাসিয়াছি ;
তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি !
চির কাল—চির কাল—তুই কি রে চিরকাল
সেই দূরে র'বি !
আধ'সুরে গাবি শুধু গীতের আভাস,
তুই চির-কবি ?
দেখা তুই দিবি না কি ? না হয় না দিলি,
একটি কি পূরাবি না আশ,
কাছে হতে একবার শুনিবারে চাই
তোর গীতোচ্ছ্বাস !
অরণ্যের, পর্ব্বতের, সমুদ্রের গান,
ঝটিকার বজ্রগীতস্বর,
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,
চেতনার, নিদ্রার মর্ম্মর,
বসন্তের, বরষার, শরতের গান,
জীবনের মরণের স্বর,

আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর,
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহ তপনের,
কোটি কোটি তারার সঙ্গীত,
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানিরে হতেছে মিলিত !
সেইখানে একবার বসাইবি মোরে ;
সেই মহা আঁধার নিশায়,
শুনিব রে আঁখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত,
তোর মুখে কেমন শুনায় !

জোৎস্নায় কুসুমবনে একাকী বসিয়া থাকি,
আঁখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে,
বল্ মোরে বল্ অয়ি মোহিনী ছলনা,
সে কি তোরি তরে ?
বিরামের গান গেয়ে সায়াহ্নের বায়
কোথা বহে যায় !
তারি সাথে কেন মোর প্রাণ হুহু করে
সে কি তোরি তরে ?

বাতাসে সুরভি ভাসে, আঁধারে কত না তারা,
আকাশে অসীম নীরবতা,
তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায়,
সে কি তোরি কথা ?
ফুল হতে গন্ধ তার বারেক বাহিরে এলে
আর ফুলে ফিরিতে না পারে,
ঘুরে ঘুরে মরে চারিধারে ;
তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি,
ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়,
সে কি তোরে চায় ?

জগতের গানগুলি দূর দূরান্তর হ'তে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা, বহ্নি হেরি পতঙ্গের মত,
পদতলে মরিবারে চায় !
জগতের মৃত গানগুলি তোর কাছে পেয়ে নব প্রাণ,
সঙ্গীতের পরলোক হ'তে গায় যেন দেহমুক্ত গান !
অই তার নব কণ্ঠধ্বনি প্রভাতের স্বপনের প্রায়,
কুসুমের সৌরভের সাথে এমন সহজে মিশে যায় !

আমরণ, চিরদিন, কেবলি খুঁজিব তোরে
কখন কি পাব না সন্ধান!
কেবলি কি র'বি দূরে অতি দূর হ'তে
শুনিব রে ওই আধ' গান!
এই বিশ্ব জগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্য্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবন-পথে খুঁজিয়া চলিব তোরে
প্রাণ মন হইবে উদাসী!
তপনেরে ঘিরি ঘিরি যেমন ঘুরিছে ধরা,
ঘুরিব কি তোর চারি দিকে!
অনন্ত প্রাণের পথে বরষিবি গীতধারা
চেয়ে আমি র'ব অনিমিখে!

তোরি মোহময় গান শুনিতেছি অবিরত
তোরি রূপ কল্পনায় লিখা,
করিস্‌নে প্রবঞ্চনা সত্য ক'রে বল্ দেখি
তুই ত নহিস্ মরীচিকা?
কতবার আর্ত্তস্বরে, শুধায়েছি প্রাণপণে
অয়ি তুমি কোথায়—কোথায়—

অমনি সুদূর হতে কেন তুমি বলিয়াছ,
"কে জানে কোথায় ?"
আশাময়ী, ওকি কথা ! তুমি কি আপনাহারা ;
আপনি জান না আপনায় ?

বিশ্ব ২

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী !
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী !
আমি সুদূরের পিয়াসী !
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর ! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী !
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাশরি' !

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী !
তুমি দুর্লভ দুরাশার মত
কি কথা আমায় শুনাও সতত !
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী !
হে সুদূর, আমি প্রবাসী !
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর ! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী !
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ,
সে কথা যে যাই পাশরি' !

আমি উন্মনা হে,

হে সুদূর, আমি উদাসী !

রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়

তরু-মর্ম্মরে. ছায়ার খেলায়,

কি মুরতি তব নীলাকাশশায়ী

নয়নে উঠে গো আভাসি !

হে সুদূর, আমি উদাসী !

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর ! তুমি যে

বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী ।

কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার

সে কথা যে যাই পাশরি' ।

বিশ্ব।

প্রবাসী।

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া!
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া!
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া!

রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে
ফুল-সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন-বিহীন
মিলনের শুভ লগনে!

আপনার যারা আছে চারি ভিতে
পারিনি তাদের আপনা করিতে,
তারা নিশি দিসি জাগাইছে চিতে
বিরহ-বেদনা সঘনে !
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে
ফিরে প্রাণ সারা গগনে !

তৃণে পুলকিত যে মাটীর ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, ক'ব তা কেমনে
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে !
সেই মূক মাটী মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে !

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে !

লক্ষ যোজন দূরের তারকা
　　মোর নাম যেন জানে সে!
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি;
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
　　কোন্ কথা মনে আনে সে!
অনাদি উষার বন্ধু আমার
　　তাকায় আমার পানে সে!

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
　　চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
　　বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে!
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
　　ঘরের বাসনা মিটাতে?
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
　　চির-জনমের ভিটাতে!

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধূলারেও মানি আপনা!
ছোট-বড়-হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা!
হই যদি মাটী, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা!
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্ত-বিহীন আপনা!

বিশাল বিশ্বে চারি দিক হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে!
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে।
ওরে মাটী, তুই আমারে কি চাস্?
মোর তরে জল দু' হাত বাড়াস?
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস
চির আহ্বান আনিছে!

পর ভাবি যারে তারা বারে বারে
সবাই আমারে টানিছে।

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যায় ঘেরে, ছোট কণাটিরে
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে!
জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চির-গৌরব,—
এ কথা না যদি শিখিলে,
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে!

ধূলা সাথে আমি ধূলা হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে!
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল
তাঁর পূজারতি বরণে!
যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,

প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে
জনমে জনমে মরণে !
যাহা হই আমি তাই হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে !

ধন্য রে আমি অনন্ত কাল !
ধন্য আমার ধরণী !
ধন্য এ মাটী, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণ-বরণী !
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে !
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন-তরণী !
যা হয়েছি আমি হয়েছি ধন্য,
ধন্য এ মোর ধরণী !

—০—

মানস-ভ্রমণ।

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে ! ওগো মা মৃণ্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,

দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত ; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটি' এ পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকীরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে।
যে ইচ্ছা উচ্ছ্বসি' উঠি বাহিরিতে চাহে
উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়—ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া। বসি' শুধু গৃহকোণে
লুব্ধচিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন
দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতূহলবশে ; আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে !—
সুদুর্গম দূর দেশ,—

পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহা পিপাসার রঙ্গভূমি ; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি স্থচি বিঁধে চোখে ;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যাপরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে'
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দ্দয় !
কত দিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে
দূর দূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে ;—চারি দিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিকনির্ম্মল স্বচ্ছ ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি' ; হিম-রেখা
নীলগিরিশ্রেণীপরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টি রোধ করি' ; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জ্জটীর তপোবন-দ্বারে !
মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরু দেশে—যেখানে লয়েছে ধরা

অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, সর্ব্ব আভরণহীন;
যেথা দীর্ঘ রাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সঙ্গীতবিহীন; রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্র জননীর মত।
নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি'
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে; সমুদ্রের তটে
ছোট ছোট নীলবর্ণ পর্ব্বতসঙ্কটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সঙ্কীর্ণ নদীটি চলি আসে, কোন মতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া; ইচ্ছা করে সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে সুখাসীন উর্ম্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি, হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে।
ইচ্ছা করে, আপনার করি

যেখানে যা-কিছু আছে ; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে ; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়-সমুদ্র হতে অস্ত-সিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনারে তুঙ্গ গিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি ;
কঠিন-পাষাণ ক্রোড়ে তীব্র হিম-বায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে ; উষ্ট্রদুগ্ধ করি' পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন ; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরী মাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ ! দ্রাক্ষাপায়ী পারসীক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সহাস্য জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশি দিনমান

কর্ম্ম-অনুরত,—সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্ব্বরতা—
নাহি কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি কোন প্রথা,
নাহি কোন বাধাবন্ধ,—নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর পর,
উন্মুক্ত জীবন-স্রোত বহে দিন রাত
সম্মুখে আঘাত করি, সহিয়া আঘাত
অকাতরে; পরিতাপজর্জ্জর পরাণে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্ত্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি',—
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালবাসি—
কত বার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে।
মানব-জীবনরসে যত আছে স্বাদ
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি' বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।

বিশ্বনৃত্য।

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা!
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়-সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

সঘন অশ্রুমগন হাস্য
জাগিবে তাহার বদনে;
প্রভাত-অরুণ-কিরণ-রশ্মি
ফুটিবে তাহার নয়নে।
দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র
ঝনন-রণন স্বর্ণ তন্ত্র,
কাঁপিয়া উঠিবে মোহন মন্ত্র
নির্ম্মল নীল গগনে।

হাহা করি' সবে উচ্ছল রবে
চঞ্চল কলকলিয়া,

চৌদিক হতে উন্মাদ স্রোতে
আসিবে তূর্ণ চলিয়া।
ছুটিবে সঙ্গে মহা তরঙ্গে
ঘিরিয়া তাঁহারে হরষরঙ্গে
বিঘ্নতরণ চরণভঙ্গে
পথকণ্টক দলিয়া।

ওগো কে বাজায় (বুঝি শুনা যায়!)
মহা রহস্যে রসিয়া
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর'পরে বসিয়া!
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল,
গগনে গগনে জ্যোতি অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।

ওগো কে বাজায় (কে শুনিতে পায়!)
না জানি কি মহা রাগিণী!
দুলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী।

ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে,
অনন্ত নভে শত বাহু তুলে,
কি গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে,
মর্ম্মরে দিনযামিনী !

নির্ঝর ঝরে উচ্ছ্বাসভরে
বন্ধুর শিলা-সরণে।
ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
পাষাণ-হৃদয়-হরণে !
কোমল কণ্ঠে কুলু কুলু স্বর
ফুটে অবিরল তরল মধুর,
সদা-শিঞ্জিত মাণিক-নূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে !

ওই কে বাজায় দিবস নিশায়
বসি অন্তর-আসনে
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,
কেহ শোনে কেহ না শোনে !
অর্থ কি তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,

মহান্ মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে !

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক্ বিশ্ব বাজনা !
উঠুক্ চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা !
টুটুক্ বন্ধ মহা আনন্দ
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ !
হৃদয়-সাগরে পূর্ণ চন্দ্র
জাগাক্ নবীন বাসনা !

—০—

বসুন্ধরা।

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কত বার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসে ! তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিলায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন

যুগ যুগান্তর ধরি' ; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু ;—তাই আজি
কোন দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া আঁখি
সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি'
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর ; তোমার অন্তরে
কি জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধরে'
করিতেছে সঞ্চরণ ; কুসুমমুকুল
কি অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে ; নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কি গূঢ় পুলকে
কি মূঢ় প্রমোদ-রসে উঠে হরষিয়া—
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত-হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন !
তাই আজি কোন দিন,—শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পূর্ণ-শীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র'পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে

আলোকে ঝিকিয়া,—জাগে মহা ব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্ব্বব্যাপী হয়ে
জলে, স্থলে, অরণ্যের পল্লব-নিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়! ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে, মিশ্রিত মর্ম্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ খেলার
পরিচিত রব! আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে—গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষসুরে, উচ্ছ্বসি' উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি' যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু;—
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন!

সহস্রের সুখে আছে রঞ্জিত তোমার
সর্ব্বদেহ, জীবস্রোত কত বারংবার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তব মৃত্তিকার সনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন, তারি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরণে ; আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে ! নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোন মুগ্ধ কান
নদীকূল হতে ? উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোন মর্ত্ত্যবাসী
নিদ্রা হতে উঠি ? আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধরে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি র'ব না আমি ? আসিব না নেমে

তাদের মুখের পরে হাসির মতন,
তাদের সর্ব্বাঙ্গ মাঝে সরস যৌবন,
তাদের বসন্তদিনে অকস্মাৎ সুখ,
তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুখ
প্রেমের অঙ্কুর রূপে? ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকা-বন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে? করিব গমন
ছাড়ি' লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি?
চতুর্দ্দিক্ হতে মোরে লবে না কি টানি
এই সব তরু লতা গিরি নদী বন,
এই চিরদিবসের সুনীল গগন,
এ জীবনপরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন-সমাজ?
ফিরিব তোমারে ঘিরি' করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয় মাঝে; কীট পশু পাখী
তরু গুল্ম লতারূপে বারংবার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে

মিটাইবে জীবনের শতলক্ষ ক্ষুধা
শতলক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে পিয়ায়ে! জননী, লহ গো মোরে,
সঘন-বন্ধন তব বাহুযুগে ধরে
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের;
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপন পুরে
আমারে লইয়া যাও—রাখিও না দূরে!



অহল্যার প্রতি।

কি স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি',
নির্ব্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপস-বিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে এক-দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তা'র মহাস্নেহ?
ছিল কি পাষাণ-তলে অস্পষ্ট চেতনা?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্য্যে মৌন মূক দুঃখ সুখ যত

অনুভব করেছিলে স্বপনের মত
সুপ্ত আত্মা মাঝে? দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষকোটি পরাণীর মিলন, কলহ,
আনন্দ-বিষাদ-ক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জ্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ
পশিত কি অভিশাপ-নিদ্রা ভেদ করে
কর্ণে তোর, জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্দ্ধজাগরণে?
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্য নিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর?
যেদিন বহিত নব বসন্ত-সমীর,
ধরণীর সর্ব্বাঙ্গের পুলক-প্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে? জীবন-উৎসাহ
জাগা'ত কি অপরূপ কম্প তব দেহে?
যামিনী পশিত যবে মানবের গেহে,
ধরণী লইত টানি' শ্রান্ত তনুগুলি
আপনার বক্ষপরে, দুঃখশ্রম ভুলি'
ঘুমাত অসংখ্য জীব—জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক,

মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটি জীবস্পর্শসুখ—
কিছু তা'র পেয়েছিলে আপনার মাঝে ?

যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,—
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা, তা'রি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্য্যম্পশ্য, নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে,—সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে,
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে ;
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায় ;
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে' পড়ে যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্ত্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।
সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপরেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা ; দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মত
সুন্দর সরল শুভ্র ; হ'য়ে বাক্যহত

চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে ;
যে শিশির পড়ে ছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হ'তে—পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ, সরস, ঘন—এখনো তাহারা
লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

সমুদ্রের প্রতি।

(পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া।)

হে আদিজননি, সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দিরপানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে

ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর, আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধি', নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এ কি সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি, ছল করি' দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি' চলি' যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি' ফিরিয়া আসি' কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে
রাশি রাশি শুভ্রহাস্তে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্ব্বসুখে
আর্দ্র করি' দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট
আশীর্ব্বাদে। নিত্য বিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি,—আদি অন্ত তাহার কোথা রে,
কোথা তা'র তল, কোথা কূল! বল কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তা'র সুগম্ভীর মৌন, তা'র সমুচ্ছল কলকথা,
তা'র ক্ষিপ্ত অট্টহাস্য, তাহার ক্রন্দন ফুলে' ফুলে'!
আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব ; ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তার—বোবার ইঙ্গিত-ভাষা হেন

আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে-
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে,—লক্ষকোটি বর্ষ ধরে'
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্ম-পূর্ব্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবী'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মত
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক্ হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি'
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা ; প্রথম গর্ভের মহা রহস্য বিপুল
না বুঝিয়া! দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্ব্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি'। প্রতি প্রাতে ঊষা এসে
অনুমান করি' যেত মহা-সন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি' নিশি নিশি নিমেষবিহীন

শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদি জননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহা ভবিষ্যৎ লাগি' হৃদয়ে আমার
যুগান্তর-স্মৃতিসম উদয় হতেছে বারংবার।
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্ম্মর স্বর। মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি'
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম্ম তারে সত্য বলি' জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পূরে'।
প্রাণভরা ভাবাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমা পানে; তুমি সিন্ধু প্রকাণ্ড হাসিয়ে

টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কি নাড়ীর টানে
আমার এ মর্ম্মখানি তোমার তরঙ্গমাঝখানে।

—০—

সুখ।

আজি মেঘমুক্ত দিন; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মত; সুমন্দ বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে; ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে; অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি', যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে; হোথা ভাঙ্গা উচ্চতীর;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত জিহ্বার মত; গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ-মগন
করিছে কৌতুকালাপ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি' পশিতেছে আসি'

কর্ণে মোর ; বসি এক বাঁধা নৌকা পরি'
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি'
রৌদ্রে পিঠ দিয়া ; উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারংবার
কলহাস্যে ; ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহজ্বালাতন।
তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার ;
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্ম্মল বিস্তার ;
মধ্যাহ্ন-আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা ; আতপ্ত পবনে
তীর-উপবন হতে কভু আসে বহি'
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি' রহি'
বিহঙ্গের শান্ত স্বর। আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা ; মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল,—কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মত, শিশু-আননের
হাসির মতন,—পরিব্যাপ্ত, বিকশিত ;
উন্মুখ অধরে ধরি' চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-বিশ্বাসে, চির রাত্রি চির দিন।

বিশ্ব-বীণা হতে উঠি' গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিথর গগন ;
সে সঙ্গীত কি ছন্দে গাঁথিব, কি করিয়া
শুনাইব, কি সহজ ভাষায় ধরিয়া
দিব তারে উপহার ভালবাসি যারে,
রেখে দিব ফুটাইয়া কি হাসি-আকারে
নয়নে অধরে, কি প্রেমে জীবনে তারে
করিব বিকাশ ? সহজ আনন্দখানি
কেমনে সহজে তারে তুলে ঘরে আনি
প্রফুল্ল সরস ?—কঠিন আগ্রহভরে
ধরি তারে প্রাণপণে,—মুঠির ভিতরে
টুটি যায় ;—হেরি' তারে তীব্রগতি ধাই,—
অন্ধবেগে বহু দূরে লঙ্ঘি' চলি যাই
আর তার না পাই উদ্দেশ।
চারি দিকে
দেখে' আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল,
মনে হল সুখ অতি সহজ সরল !

—o—

ধরাতল।

ছোট কথা ছোট গীত আজি মনে আসে।
চোখে পড়ে যাহা কিছু হেরি চারি পাশে।
আমি যেন চলিয়াছি বাহিয়া তরণী,
কূলে কূলে দেখা যায় শ্যামল ধরণী।
সবি বলে, যাই যাই, নিমেষে নিমেষে,—
ক্ষণকাল দেখি বলে' দেখি ভালবেসে।
তীর হতে দুঃখ সুখ দুই ভাই বোনে
মোর মুখপানে চায় করুণ-নয়নে।
ছায়াময় গ্রামগুলি দেখা যায় তীরে,
মনে ভাবি, কত প্রেম আছে তারে ঘিরে।
যবে চেয়ে চেয়ে দেখি উৎসুক-নয়ানে
আমার পরাণ হতে ধরার পরাণে,—
ভালো মন্দ দুঃখ সুখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো!

—০—

তত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য।

শুনিয়াছি নিম্নে তব, হে বিশ্বপাথার,
নাহি অন্ত মহামূল্য মণি-মুকুতার।

নিশিদিন দেশে দেশে পণ্ডিত ডুবারি
রত রহিয়াছে কত অন্বেষণে তা'রি।
তাহে মোর নাহি লোভ, মহা পারাবার!
যে আলোক জ্বলিতেছে উপরে তোমার,
যে রহস্য দুলিতেছে তব বক্ষতলে,
যে মহিমা প্রসারিত তব নীলজলে,
যে সঙ্গীত উঠে তব নিয়ত আঘাতে,
যে বিচিত্র লীলা তব মহানৃত্যে মাতে,
এ জগতে কভু তা'র অন্ত যদি জানি,—
চিরদিনে কভু তাহে শ্রান্তি যদি মানি
তোমার অতলমাঝে ডুবিব তখন,
যেথায় রতন আছে অথবা মরণ।

—০—

মধ্যাহ্ন।

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জ্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্দ্ধমগ্ন তরীপরে
মাছরাঙা বসি', তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে

জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাট তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যাম শষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ,—চলে যায় বহু দূর।
থেকে থেকে ডেকে উঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্ম্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য পরে
চীলের সুতীব্রধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত্ত শব্দ বাঁধা তরণীর,—মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী।

প্রবাস-বিরহ-দুঃখ মনে নাহি বাজে ;—
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে ;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে,—ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখী পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
জন্মে,—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে—মাতৃস্তনে শিশুর মতন—
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ !

—০—

সভ্যতার প্রতি।

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লহ তব লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব-সভ্যতা ! হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি,—সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবারধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন

মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণ-পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব ;—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,—
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন !

—০—

বন।

শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি,
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি !
নিশ্চল নির্জ্জীব নহ সৌধের মতন,—
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুল ফল,
দাও বস্ত্র, দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা ;
নিশিদিন মর্ম্মরিয়া কহ কত কথা
অজানা ভাষার মন্ত্র ; বিচিত্র সঙ্গীতে
গাও জাগরণ-গাথা ; গভীর নিশীথে
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মত
জননী-বক্ষের ; বিচিত্র হিল্লোলে কত

খেলা কর শিশু সনে ; বৃদ্ধের সহিত
কহ সনাতন বাণী বচন-অতীত !

পদ্মা।

হে পদ্মা আমার !
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার !
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য্য অস্তগামী
তোমারে আমার প্রাণ সঁপেছিনু আমি।
অবসান সন্ধ্যালোকে আছিলে সে দিন
নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন ;—
সন্ধ্যাতারা একাকিনী সস্নেহ কৌতুকে
চেয়ে ছিল তোমা পানে হাসিভরা মুখে।
সে দিনের পর হতে, হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার।

নানা কর্ম্মে মোর কাছে আসে নানা জন,
নাহি জানে আমাদের পরাণ-বন্ধন,

নাহি জানে কেন আসি সন্ধ্যা-অভিসারে
বালুকা-শয়ন-পাতা নির্জ্জন এ পারে।
যখন মুখর তব চক্রবাক-দল
সুপ্ত থাকে জলাশয়ে ছাড়ি কোলাহল,
যখন নিস্তব্ধ গ্রামে তব পূর্ব্বতীরে
রুদ্ধ হয়ে যায় দ্বার কুটীরে কুটীরে,
তুমি কোন্ গান কর আমি কোন্ গান
দুই তীরে কেহ তার পায়নি সন্ধান।
নিভৃতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
শতবার দেখা শুনা তোমায় আমায়।

কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে
যদি কোন দূরতর জন্মভূমি হতে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খর স্রোতে,—
কত গ্রাম কত মাঠ কত ঝাউঝাড়
কত বালুচর কত ভেঙ্গে-পড়া পাড়
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন,
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন?
জন্মান্তরে শতবার যে নির্জ্জন তীরে

গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে,—
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায় ?

পূর্ণিমা।

পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা,
সঙ্গিহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা
করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব; পড়ে' হয় শেখা
সৌন্দর্য্য কাহারে বলে—আছে কি কি বীজ
কবিত্ব-কলায় ;—শেলি, গেটে, কোল্‌রীজ
কার্ কোন্ শ্রেণী ! পড়ি' পড়ি' বহুক্ষণ
তাপিয়া উঠিল শির, শ্রান্ত হল মন,
মনে হল সব মিথ্যা, কবিত্ব কল্পনা
সৌন্দর্য্য সুরুচি রস সকলি জল্পনা
লিপি-বণিকের ;—
অবশেষে শ্রান্তি মানি
তন্দ্রাতুর চোখে, বন্ধ করি গ্রন্থখানি

ঘড়ীতে দেখিনু চাহি দ্বিপ্রহর রাতি,
চমকি আসন ছাড়ি নিবাইনু বাতি।
যেমনি নিবিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্ত দ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দ্দিক হতে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি'
ত্রিভুবনবিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি!
হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তরশায়িনী! নাহি সীমা
তব রহস্যের! এ কি মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্ক চিত্ত সৌন্দর্য্য-উচ্ছ্বাসে
মুহূর্ত্তে ডুবালে? কখন্ দুয়ারে এসে
মু'খানি বাড়ায়ে, অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে, এক প্রান্তে, সুররাণী,
সুদূর নক্ষত্র হতে সাথে করে' আনি'
বিশ্বভরা নীরবতা! আমি গৃহকোণে
তর্কজালবিজড়িত ঘন বাক্যবনে
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ অক্ষরের পথে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে,
তোমারি সন্ধানে। উদ্ভ্রান্ত এ ভকতেরে
এতক্ষণ ঘুরাইলে ছলনার ফেরে!

কি জানি কেমন করে' লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে
হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী ! মুগ্ধ কর্ণপুটে
গ্রন্থ হতে গুটিকত বৃথা বাক্য উঠে'
আচ্ছন্ন করিয়াছিল কেমনোনা জানি
লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌন বাণী !

—o—

সমুদ্র।

কিসের অশান্তি এই মহা পারাবারে !
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন !
অব্যক্ত অস্ফুট বাণী ব্যক্ত করিবারে
শিশুর মতন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন !
যুগযুগান্তর ধরি যোজন যোজন
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে উত্তাল উচ্ছ্বাস ;
অশান্ত বিপুল প্রাণ করিছে গর্জ্জন,
নীরবে শুনিছে তাই প্রশান্ত আকাশ।
আছাড়ি' চূর্ণিতে চাহে সমগ্র হৃদয়
কঠিন পাষাণময় ধরণীর তীরে,
জোয়ারে সাধিতে চায় আপন প্রলয়,
ভাঁটায় মিলাতে চায় আপনার নীরে !

অন্ধ প্রকৃতির হৃদে মৃত্তিকায় বাঁধা
সতত ঢুলিছে ওই অশ্রুর পাথার,
উন্মুখী বাসনা পায় পদে পদে বাধা,
কাঁদিয়া ভাসাতে চাহে জগৎ-সংসার!
সাগরের কণ্ঠ হ'তে কেড়ে নিয়ে কথা
সাধ যায় ব্যক্ত করি মানব ভাষায়;
শান্ত করে' দিই ওই চির ব্যাকুলতা,
সমুদ্র-বায়ুর ওই চির হায় হায়।
একটি সঙ্গীতে মোর দিবস রজনী
ধ্বনিবে পৃথিবী-ঘেরা সঙ্গীতের ধ্বনি!

—০—

সিন্ধুতীরে।

হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কাণাকাণি,
ধ্বনিত হতেছে চির-দিবসের বাণী।
চির-দিবসের রবি ওঠে অস্ত যায়,
চির-দিবসের কবি গাহিছে হেথায়!
ধরণীর চারি দিকে সীমাশূন্য গানে
সিন্ধু শত তটিনীরে করিছে আহ্বান,
হেথায় দেখিলে চেয়ে আপনার পানে
দুই চোখে জল আসে, কেঁদে ওঠে প্রাণ!

শত যুগ হেথা বসে মুখ পানে চায়,
বিশাল আকাশে পাই হৃদয়ের সাড়া।
তীব্র বক্র ক্ষুদ্র হাসি পায় যদি ছাড়া
রবির কিরণে এসে মরে সে লজ্জায়!
সবারে আনিতে বুকে বুক বেড়ে যায়,
সবারে করিতে ক্ষমা আপনারে ছাড়া।

—o—

স্বার্থ।

কেরে তুই, ওরে স্বার্থ, তুই কতটুক্,
তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্রহ্মাণ্ডের মুখ,
লুকায় অনন্ত সত্য,—স্নেহ সখ্য প্রীতি
মুহূর্ত্তে ধারণ করে নির্লজ্জ বিকৃতি,—
থেমে যায় সৌন্দর্য্যের গীতি চিরন্তন
তোর তুচ্ছ পরিহাসে! ওগো বন্ধুগণ
সব স্বার্থ পূর্ণ হোক্! ক্ষুদ্রতম কণা
ভাণ্ডারে টানিয়া আন—কিছু ত্যজিয়ো না!
আমি লইলাম বাছি চিরপ্রেমখানি,
জাগিছে যাহার মুখে অনন্তের বাণী
অমৃতে অশ্রুতে মাখা! মোর তরে থাক্
পরিহাস্য পুরাতন বিশ্বাস নির্ব্বাক্!

থাক্ মহাবিশ্ব, থাক্ হৃদয়-আসীনা
অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা !

বিশ্বলক্ষ্মী।

হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী, হে বীণাবাদিনী,
আজি মোর চিত্তপদ্মে বসি একাকিনী
ঢালিতেছ স্বর্গসুধা ; মাথার উপর
সদ্যঃস্নাত বরষার স্বচ্ছ নীলাম্বর
রাখিয়াছে স্নিগ্ধহস্ত আশীর্ব্বাদে ভরা ;
সম্মুখেতে শস্যপূর্ণ হিল্লোলিত ধরা
বুলায় নয়নে মোর অমৃত-চুম্বন ;
উতলা বাতাস আসি করে আলিঙ্গন ;
অন্তরে সঞ্চার করি আনন্দের বেগ
বহে যায় ভরা নদী ; মধ্যাহ্নের মেঘ
স্বপ্নমালা গাঁথি' দেয় দিগন্তের ভালে।
তুমি আজি মুগ্ধমুখী আমারে ভুলালে,
ভুলাইলে সংসারের শতলক্ষ কথা—
বীণাস্বরে রচি দিলে মহা নীরবতা।

শান্তিমন্ত্র।

কাল আমি তরী খুলি' লোকালয় মাঝে
আবার ফিরিয়া যাব আপনার কাজে,—
হে অন্তর্যামিনী দেবী ছেড়ো না আমারে,
যেয়ো না একেলা ফেলি জনতা-পাথারে
কর্ম্মকোলাহলে! সেথা সর্ব্বঝঞ্ঝনায়
নিত্য যেন বাজে চিত্তে তোমার বীণায়
এমনি মঙ্গলধ্বনি। বিদ্বেষের বাণে
বক্ষ বিদ্ধ করি' যবে রক্ত টেনে আনে
তোমার সান্ত্বনা সুধা অশ্রুবারি সম
পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষত প্রাণে মম।
বিরোধ উঠিবে গর্জ্জি' শতফণা ফণী,
তুমি মৃদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্রধ্বনি—
স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা—বোলো কানে কানে-
আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে।

—০—

ইছামতী নদী।

অয়ি তন্বী ইছামতী! তব তীরে তীরে
শান্তি চিরকাল থাক্ কুটীরে কুটীরে,—

শস্যে পূর্ণ হোক্ ক্ষেত্র তব তটদেশে !—
বর্ষে বর্ষে বরষায় আনন্দিতবেশে
ঘনঘোরঘটা সাথে বজ্রবাদ্য রবে
পূর্ব্ববায়ু-কল্লোলিত তরঙ্গ-উৎসবে
তুলিয়া আনন্দধ্বনি দক্ষিণে ও বামে,
আশ্রিত পালিত তব দুই তটগ্রামে
সমারোহে চলে এস শৈলগৃহ হতে
সৌভাগ্যে শোভায় গর্ব্বে উল্লসিত স্রোতে
যখন রব না আমি, রবে না এ গান,
তখনো ধরার বক্ষে সঞ্চারিয়া প্রাণ,
তোমার আনন্দগাথা এ বঙ্গে, পার্ব্বতী,
বর্ষে বর্ষে বাজিবেক অয়ি ইছামতী !

—০—

শুশ্রূষা ।

ব্যথাক্ষত মোর প্রাণ লয়ে তব ঘরে
অতিথি-বৎসলা নদী কত স্নেহভরে
শুশ্রূষা করিলে আজি,—স্নিগ্ধ হস্তখানি
দগ্ধ হৃদয়ের মাঝে সুধা দিল আনি !
সায়াহ্ন আসিল নামি,—পশ্চিমের তীরে
ধান্যক্ষেত্রে রক্ত রবি অস্ত গেল ধীরে,—

পূর্ব্বতীরে গ্রাম বন নাহি যায় দেখা,
জ্বলন্ত দিগন্তে শুধু মসীপুঞ্জরেখা ;
সেথা অন্ধকার হতে আনিছে সমীর
কর্ম্ম-অবসানধ্বনি অজ্ঞাত পল্লীর।
দুই তীর হতে তুলি দুই শান্তি-পাখা
আমারে বুকের মাঝে দিলে তুমি ঢাকা !
চুপি চুপি বলি' দিলে—বৎস, জেনো সার,
সুখ দুঃখ বাহিরের, শান্তি সে আত্মার !

—o—

আশিষ-গ্রহণ।

চলিয়াছি রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে !
সংসার-বিপ্লবধ্বনি আসে দূর হতে।
বিদায় নেবার আগে, পারি যতক্ষণ
পরিপূর্ণ করি লই মোর প্রাণমন
নিত্য উচ্চারিত তব কলকণ্ঠস্বরে
উদার মঙ্গলমন্ত্রে,—হৃদয়ের পরে
লই তব শুভস্পর্শ, কল্যাণসঞ্চয় !
এই আশীর্ব্বাদ কর, জয় পরাজয়
ধরি যেন নম্রচিত্তে করি শির নত
দেবতার আশীর্ব্বাদী কুসুমের মত।

বিশ্বস্ত স্নেহের মূর্ত্তি দুঃস্বপ্নের প্রায়
সহসা বিরূপ হয়—তবু যেন তায়
আমার হৃদয়সুধা না পায় বিকার,
আমি যেন আমি থাকি নিত্য আপনার !

—০—

বিদায়।

হে তটিনী ! সে নগরে নাই কলস্বন
তোমার কণ্ঠের মত ;—উদার গগন
—অলিখিত মহাশাস্ত্র—নীল পত্রগুলি
দিক্ হতে দিগন্তরে নাহি রাখে খুলি' ;—
শান্ত স্নিগ্ধ বসুন্ধরা শ্যামল অঞ্জনে
সত্যের স্বরূপখানি নির্ম্মল নয়নে
রাখে না নবীন করি' ; সেথায় কেবল
একমাত্র আপনার অন্তর সম্বল
অকূলের মাঝে। তাই ভীত শিশুপ্রায়
হৃদয় চাহে না আজি লইতে বিদায়
তোমা সবাকার কাছে, তাই প্রাণপণে
আঁকড়িয়া ধরিতেছে আর্ত্ত আলিঙ্গনে
নির্জ্জন-লক্ষ্মীরে। শুভ শান্তিপত্র তব
অন্তরে বাঁধিয়া দাও, কণ্ঠে পরি লব !

সন্ধ্যা।

ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা ! ওরে মন,
নত কর শির ! দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা' এ বিশ্ব-মন্দিরে
এল আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ-গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি। ধীরে নামাইয়া আন
বিদ্রোহের উচ্চ-কণ্ঠ পূরবীর ম্লান-
মন্দস্বরে ! রাখ রাখ অভিযোগ তব,—
মৌন কর বাসনার নিত্য নব নব
নিষ্ফল বিলাপ ! হের মৌন নভস্তল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জল স্থল
স্তম্ভিত বিষাদে নম্র ! নির্ব্বাক্ নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা সতী,—নয়নপল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়নযুগল,—
অনন্ত আকাশপূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে

সান্ত্বনা-পরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
শান্ত মনে, সন্ধি কর অনন্তের সনে
সন্ধ্যার আলোকে! বিন্দু দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার—অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি! অন্তরের যত কথা
শান্ত হয়ে গিয়ে—মর্ম্মান্তিক নীরবতা
করুক বিস্তার!

হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম! পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন
কুটীর-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হল সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়। অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম-অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি'
দিগন্তের পানে; ধীরে যেতেছে প্রবাহি'
সম্মুখে আলোকস্রোত অনন্ত অম্বরে

নিঃশব্দচরণে ; আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ত তারা, সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মত ! ধীরে যেন উঠে ভেসে।
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন-নিমেষে
কত যুগযুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা,
তার পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ !

ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্ব-পরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। (নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন—ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্যপানে—"আরো কোথা ?" "আরো কত দূর ?")

১ম ভাগ, ১ম খণ্ড।

বর্ণানুক্রম সূচী।

-০—

কাব্য-গ্রন্থ।

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় খণ্ড।



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন এম্, এ,

সম্পাদক।

প্রকাশক—এস্, সি, মজুমদার।
২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
মজুমদার লাইব্রেরী।

কলিকাতা,—২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট,
ভারত-মিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৭ সন।

কাব্য-গ্রন্থ।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১ম ভাগ, ২য় খণ্ডের সূচী।

সোনার তরী।

—০—

লোকালয়।

সোনার তরী।

তোমায়

চিনি বলে' আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে ;
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে ।
কত জন এসে মোরে ডেকে কয়—
"কে গো সে" —শুধায় তব পরিচয়,
"কে গো সে ?"—
তখন কি কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি "কি জানি কি জানি !"
তুমি শুনে' হাস, তারা দূষে মোরে
কি দোষে !

তোমার

অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি
অনেক গানে ।
গোপন বারতা লুকায়ে রাখিতে
পারিনি আপন প্রাণে !
কত জন মোরে ডাকিয়া কয়েছে—
"যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে
কিছু কি ?"
তখন কি কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি "অর্থ কি জানি !"
তারা হেসে' যায়, তুমি হাস বসে
মুচুকি' ।

তোমায় জানি না চিনি না এ কথা বল ত
কেমনে বলি ?
খনে খনে তুমি উঁকি মারি' চাও,
খনে খনে যাও ছলি'
জোৎস্না-নিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
দেখেছি তোমার ঘোম্‌টা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে !
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি',
অকারণে আঁখি উঠিছে আকুলি',
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে !

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি
কথার ডোরে ।
চিরকাল তরে গানের সুরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধরে'
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশীতে ভরেছি কোমল নিখাদ,
তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি
দিলে কি ?
কাজ নাই, তুমি যা খুসি তা কর,
ধরা নাই দাও, মোর মন হর,
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি !

সোনার তরী।

সোনার তরী।

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে' আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরাপালে চলে যায়, কোন দিকে নাহি চায়,

ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙ্গে দু'ধারে,
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে!

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে!
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে!
যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুসি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে!

যত চাও তত লও তরণী পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে'।
এতকাল নদীকূলে যাহা ল'য়ে ছিনু ভুলে'
সকলি দিলাম তুলে' থরে বিথরে,
এখন আমারে লহ করুণা করে'!

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি'।
শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

দিনশেষে।

দিন শেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী ;
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
"হাঁগো এ কাদের দেশে বিদেশী নামিনু এসে,"
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—
অমনি কথা না বলি' ভরা ঘট ছলছলি'
নতমুখে গেল চলি তরুণী !
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।

নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন-শয়নে,
এ দেশ লেগেছে ভাল নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া, পাতাগুলি গতিহারা,
পাখী যত ঘুমে সারা কাননে,—
শুধু এ সোনার সাঁঝে বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকণে।
এ দেশ লেগেছে ভাল নয়নে।

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে,
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।

শ্বেত পাথরেতে গড়া পথখানি ছায়া-করা
ছেয়ে গেছে ঝরে'-পড়া বকুলে।
সারি সারি নিকেতন, বেড়া-দেওয়া উপবন,
দেখে পথিকের মন আকুলে।
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।

রাজার প্রাসাদ হ'তে অতি দূর বাতাসে
ভাসিছে পূরবী গীতি আকাশে।
ধরণী সমুখপানে চলে গেছে কোন্‌খানে,
পরাণ কেন কে জানে উদাসে!
ভাল নাহি লাগে আর আসা যাওয়া বারবার
বহু দূর দুরাশার প্রবাসে।
পূরবী রাগিণী বাজে আকাশে।

কাননে প্রাসাদচূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী!
যদি হেথা খুঁজে পাই মাথা রাখিবার ঠাঁই,
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি ;—
যেখানে পথের বাঁকে গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী!
এই ঘাটে বাঁধ মোর তরণী!

হৃদয়-যমুনা।

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস ওগো এস, মোর
হৃদয়-নীরে!
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে!
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস ওগো এস, মোর
হৃদয়-নীরে!

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে;
হেথা শ্যাম দূর্ব্বাদল নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে,

চাহিয়া মঞ্জুল বনে কি জানি পড়িবে মনে,
বসি কুঞ্জে তৃণাসনে শ্যামল কূলে।
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে !

যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস, হেথা
গহন-তলে !
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এস আজ
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি',
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি' উরসে গলে।
ঘুরে ফিরে চারিপাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কি ছলে !
যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস, হেথা
গহন-তলে !

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে !
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে !

নাহি রাত্রি দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীত গান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে!
যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে!

পিয়াসী।

আমি ত চাহিনি কিছু।
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিলাম
নয়ন করিয়া নীচু।
তখনো ভোরের আলস-অরুণ
আঁখিতে রয়েছে ঘোর,
তখনো বাতাসে জড়ানো রয়েছে
নিশির শিশির লোর।
নূতন তৃণের উঠিছে গন্ধ
মন্দ প্রভাত-বায়ে;
তুমি একাকিনী কুটীর বাহিরে
বসিয়া অশথ-ছায়ে

নবীন-নবনী-নিন্দিত করে
দোহন করিছ দুগ্ধ ;
আমি ত কেবল বিধুর বিভোল
দাঁড়ায়ে ছিলাম মুগ্ধ।

আমি ত কহিনি কথা।
বকুল-শাখায় জানি না কি পাখী
কি জানা'ল ব্যাকুলতা !
আম্র-কাননে ধরেছে মুকুল,
ঝরিছে পথের পাশে ;
গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি করে
মৌমাছি উড়ে আসে।
সরোবর পারে খুলিছে দুয়ার
শিব-মন্দির ঘরে,
সন্ন্যাসী গাহে ভোরের ভজন
শান্ত গভীর স্বরে।
ঘট লয়ে কোলে বসি তরুতলে
দোহন করিছ দুগ্ধ ;
শূন্য পাত্র বহিয়া মাত্র
দাঁড়ায়ে ছিলাম লুব্ধ।

আমি ত যাইনি কাছে ।
উতলা বাতাস অলকে তোমার
কি জানি কি করিয়াছে ।
ঘণ্টা তখন বাজিছে দেউলে,
আকাশ উঠিছে জাগি ;
ধরণী চাহিছে ঊর্দ্ধ-গগনে
দেবতা-আশিস মাগি ।
গ্রাম-পথ হ'তে প্রভাত আলোতে
উড়িছে গোখুর ধূলি,—
উচ্ছলিত ঘট বেড়ি কটিতটে
চলিয়াছে বধূগুলি ।
তোমার কাঁকণ বাজে ঘন ঘন
ফেনায়ে উঠিছে দুগ্ধ ;
পিয়াসী নয়নে ছিনু এক কোণে
পরাণ নীরবে ক্ষুব্ধ ।

—০—

পসারিণী ।

ওগো পসারিণী, দেখি আয়,
কি রয়েছে তব পসরায় !

এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি
কোমল করুণ ক্লান্তকায় !
কোথা কোন্ রাজপুরে যাবে আরো কত দূরে
কিসের দুরূহ দুরাশায় !
সম্মুখে দেখ ত চাহি পথের যে সীমা নাহি,
তপ্ত-বালু অগ্নিবাণ হানে !
পসারিণী কথা রাখো, দূর পথে যেয়োনাকো,
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে !

হেথা দেখ শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল ;
কূলে কূলে ভরা দিঘি, কাকচক্ষু জল।
ঢালু পাড়ি চারি পাশে কচি কচি কাঁচা ঘাসে
ঘনশ্যাম চিকণ-কোমল !
পাষাণের ঘাটখানি, কেহ নাই জনপ্রাণী,
আম্রবন নিবিড় শীতল।
থাক্ তব বিকি-কিনি ওগো শ্রান্ত পসারিণী,
এইখানে বিছাও অঞ্চল !

ব্যথিত চরণ দুটি ধুয়ে নিবে জলে,
বনফুলে মালা গাঁথি পরি নিবে গলে।

আম্রমঞ্জরীর গন্ধ বহি আনি মৃদুমন্দ
বায়ু তব উড়াবে অলক,
ঘুঘুডাকে ঝিল্লীরবে কি মন্ত্র শ্রবণে কবে,
মুদে যাবে চোখের পলক!
পসরা নামায়ে ভূমে যদি ঢুলে পড় ঘুমে,
অঙ্গে লাগে সুখালস ঘোর।
যদি ভুলে তন্দ্রাভরে ঘোমটা খসিয়া পড়ে,
তাহে কোন শঙ্কা নাহি তোর!

যদি সন্ধ্যা হয়ে আসে, সূর্য্য যায় পাটে,
পথ নাহি দেখা যায় জনশূন্য মাঠে,—
নাই গেলে বহুদূরে, বিদেশের রাজপুরে,
নাই গেলে রতনের হাটে!
কিছু না করিয়ো ডর, কাছে আছে মোর ঘর,
পথ দেখাইয়া যাব আগে;
শশিহীন অন্ধ রাত, ধরিয়ো আমার হাত,
যদি মনে বড় ভয় লাগে!
শয্যা শুভ্রফেননিভ, স্বহস্তে পাতিয়া দিব,
গৃহকোণে দীপ দিব জ্বালি,

দুগ্ধ-দোহনের রবে কোকিল জাগিবে যবে
আপনি জাগায়ে দিব কালি!
ওগো পসারিণী
মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে, সবাই বিশ্রাম করে,
দগ্ধ পথে উড়ে তপ্তবালি,
দাঁড়াও, যেও না আর, নামাও পসরা ভার,
মোর হাতে দাও তব ডালি!

ভ্রষ্ট লগ্ন।

শয়ন-শিয়রে প্রদীপ নিবেছে যবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল-রবে।
অলসচরণে বসি বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।
এমন সময়ে অরুণ-ধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধাল কাতরে,—"সে কোথায়, সে কোথায়!"
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি,—

সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
"নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!"

গোধূলি বেলায় তখনো জ্বালেনি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টীপ;—
কনক-মুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে—
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন মনে।
হেনকালে এল সন্ধ্যাধূসর পথে
করুণ-নয়ন তরুণ পথিক রথে।
ফেনায় ঘর্ম্মে আকুল অশ্বগুলি
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।
শুধাল কাতরে,—"সে কোথায়, সে কোথায়!"
ক্লান্তচরণে আমারি দুয়ারে নামি।
সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
"শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!"

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিণ-বাতাস মরিছে বুকের পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,
দুয়ার সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।

ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসর-গেহ,
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি,
দূর্ব্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।
রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি',—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
"হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!"

—০—

ভগ্ন-মন্দির।

ভাঙা দেউলের দেবতা!
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্না
বীণার তন্ত্রী বিরতা!
সন্ধ্যা-গগনে ঘোষে না শঙ্খ
তোমার আরতি-বারতা!
তব মন্দির স্থির-গম্ভীর,
ভাঙা দেউলের দেবতা!

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
নব-বসন্ত-পবনে!

যে ফুলে রচেনি পূজার অর্ঘ্য,
রাখেনি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার
জনহীন ভাঙা ভবনে।

পূজাহীন তব পূজারী
কোথা সারাদিন ফিরে উদাসীন
কার প্রসাদের ভিখারী!
গোধূলি বেলায় বনের ছায়ায়
চির-উপবাস-ভুখারী
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে
পূজাহীন তব পূজারী!

ভাঙা দেউলের দেবতা!
কত উৎসব হইল নীরব
কত পূজানিশা বিগতা!
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা
কত যায় কত কব তা',
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন
ভাঙা দেউলের দেবতা!

ঝড়ের দিনে।

আজি এই আকুল আশ্বিনে,
মেঘে-ঢাকা দুরন্ত দুর্দ্দিনে,
হেমন্ত ধানের ক্ষেতে বাতাস উঠেছে মেতে,
কেমনে চলিবে পথ চিনে ?
আজি এই দুরন্ত দুর্দ্দিনে !

দেখিছ না ওগো সাহসিকা
ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা !
মনে ভেবে দেখ তবে এ ঝড়ে কি বাঁধা রবে
কবরীর শেফালি-মালিকা ?
ভেবে দেখ ওগো সাহসিকা !

আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়
নূপুর বাঁধে কি কেহ পায় ?
যদি আজি বৃষ্টিজল ধুয়ে দেয় নীলাঞ্চল
গ্রামপথে যাবে কি লজ্জায়
আজিকার এমন ঝঞ্ঝায় ?

হে উতলা, শোন কথা শোন !
দুয়ার কি খোলা আছে কোনো ?

এ বাঁকা পথের শেষে মাঠ যেথা মেঘে মেশে
বসে' কেহ আছে কি এখনো
এ দুর্যোগে, শোন ওগো শোন!

আজ যদি দীপ জ্বালে দ্বারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে?
আজ যদি বাজে বাঁশি গান কি যাবে না ভাসি'
আশ্বিনের অসীম আঁধারে
ঝড়ের ঝাপটে বারে বারে?

মেঘ যদি ডাকে গুরু গুরু,
নৃত্য মাঝে কেঁপে ওঠে ঊরু,
কাহারে করিবে রোষ, কার পরে দিবে দোষ
বক্ষ যদি করে দুরু দুরু,
মেঘে ডেকে ওঠে গুরু গুরু!

যাবে যদি,—মনে ছিল না কি,
আমারে নিলে না কেন ডাকি?
আমি ত পথেরি ধারে বসিয়া ঘরের দ্বারে
আনমনে ছিলাম একাকী
আমারে নিলে না কেন ডাকি?

কখন্ প্রহর গেছে বাজি,
কোন কাজ নাহি ছিল আজ ;
ঘরে আসে নাই কেহ, সারা দিন শূন্য গেহ,
বিলাপ করেছে তরুরাজি।
কোন কাজ নাহি ছিল আজি !

যত বেগে গরজিত ঝড়,
যত মেঘে ছাইত অম্বর,
রাত্রে অন্ধকারে যত পথ অকুরান্ হত
আমি নাহি করিতাম ডর—
যত বেগে গরজিত ঝড়।

বিদ্যুতের চমকানি-কালে
এ বক্ষ নাচিত তালে তালে ;
উত্তরী উড়িত মম উন্মুখ পাখার সম ;
মিশে যেতে আকাশে পাতালে
বিদ্যুতের চমকানি-কালে।

তোমায় আমায় একত্তর
সে যাত্রা হইত ভয়ঙ্কর।

তোমার নূপুর আজি প্রলয়ে উঠিত বাজি,
বিজুলী হানিত আঁখি'পর,
যাত্রা হ'ত মত্ত ভয়ঙ্কর!

কেন আজি যাও একাকিনী?
কেন পায়ে বেঁধেছ কিঙ্কিনী?
এ দুর্দ্দিনে কি কারণে পড়িল তোমার মনে
বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী?
কোথা আজি যাও একাকিনী?

—০—

পরামর্শ।

সূর্য্য গেল অস্তপারে,—
লাগ্‌ল গ্রামের ঘাটে
আমার জীর্ণ তরী।
শেষ বসন্তের সন্ধ্যা-হাওয়া
শস্যশূন্য মাঠে
উঠ্‌ল হাহা করি।
আর কি হবে নূতন যাত্রা
নূতন রাণীর দেশে
নূতন সাজে সেজে?

এবার যদি বাতাস উঠে'
তুফান জাগে শেষে
ফিরে আস্‌বি নে যে!
অনেকবার ত হাল ভেঙেছে
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে
ওরে দুঃসাহসী!
সিন্ধুপানে গেছিস্ ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন রসারসি।
এখন কি আর আছে সে বল?
বুকের তলা তোর
ভরে' উঠ্‌ছে জলে।
অশ্রু সেঁচে' চল্‌বি কত
আপন ভারে তোর
তলিয়ে যাবি তলে!

এবার তবে ক্ষান্ত হ'য়ে
ওরে শ্রান্ত তরী!
রাখ্‌রে আনাগোনা!

বর্ষ-শেষের বাঁশী বাজে
সন্ধ্যা-গগন ভরি,
ঐ যেতেছে শোনা!
এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রহি';
ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি'!
ইচ্ছা যদি করিস্ তবে
এ পার হতে পারে
যাস্ রে খেয়া বেয়ে!
আন্‌বে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলে মেয়ে!
ও পারেতে ধানের খোলা
এই পারেতে হাট,
মাঝে শীর্ণ নদী,
সন্ধ্যা-সকাল করবি শুধু
এ ঘাট ও ঘাট,

ইচ্ছা করিস যদি !
হায় রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে !
কর্ণ ধরে' বসেছে তার
যমদূতের সম
স্বভাব সর্ব্বনেশে !
ঝড়ের নেশা ঢেউয়ের নেশা
ছাড়বেনাক আর,
হায় রে মরণ-লুভী !
ঘাটে সে কি রৈবে বাঁধা,
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকা-ডুবি !

পথে।

গাঁয়ের পথে চলেছিলেম
অকারণে ;
বাতাস বহে বিকালবেলা
বেণুবনে।

ছায়া তখন আলোর ফাঁকে
লতার মত জড়িয়ে থাকে,
একা একা কোকিল ডাকে
নিজমনে।
আমি কোথায় চলেছিলেম

জলের ধারে কুটীরখানি
পাতা-ঢাকা,
দ্বারের পরে নুয়ে পড়ে
নিম্বশাখা!
ঐ যে শুনি মাঝে মাঝে—
না-জানি কোন্ নিত্যকাজে
কোথায় দুটি কাঁকণ বাজে
গৃহকোণে!
যেতে যেতে এলেম হেথা
অকারণে!

দীঘির জলে ঝলক্ ঝলে
মাণিক্ হীরা,

শর্ষেক্ষেতে উঠচে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়ে,
কত গাছের ছায়ে ছায়ে,
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে!
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে।

আরেক দিন সে ফাগুন মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে, সেই
মনে জাগে।
আমের বোলের গন্ধে অবশ
বাতাস ছিল উদাস অলস,
ঘাটের শানে বাজচে কলস
ক্ষণে ক্ষণে!
সে সব কথা ভাবচি বসে'
অকারণে।

দীর্ঘ হয়ে পড়ছে পথে
বাঁকা ছায়া,
গোষ্ঠ ঘরে ফিরছে ধেনু
শ্রান্তকায়া।
গোধূলিতে ক্ষেতের পরে
ধূসর আলো ধূধূ করে,
বসে' আছে খেয়ার তরে
পান্থ জনে।
আবার ধীরে চল্‌চি ফিরে
অকারণে!

—০—

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার
কহ আমায় ধনী,
তাহা হলে সেই বাণিজ্যের
কর্‌ব মহাজনী!

দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে
ছায়ার মত চরণদেশে

কঠিন তব নূপুর ঘেঁসে
আর বসে না রৈব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।

যাবই আমি যাবই ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই!
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই!

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি,
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি,
কোন্ নগরে যাব, দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি!
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি'
কূল-কিনারা পরিহরি'
কোন্ দিকে রে বাইব তরী
অকূল কালো নীরে!
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
বালু মরুর তীরে!

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই!
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই!

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে:
সূর্য্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক্ মারে মেঘে।

দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব ত তবু!
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রৈব না আর কভু!

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে ত পাবই!

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।

নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগ-নদী।
সোনার রেণু আন্‌ব ভরি
সেথায় নামি যদি।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই তবু
আর কারে ত পাবই!

অকূল মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।

নব নব পবনভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে'
অপূর্ব্ব ধন যত।
ভিখারী তোর ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মত।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই তবু
আর কারে ত পাবই!

—o—

কর্ণধার।

কত দিবা কত বিভাবরী
কত নদী নদে লক্ষ স্রোতের
মাঝখানে এক পথ ধরি',
কত ঘাটে ঘাটে লাগায়ে,
কত সারি গান জাগায়ে,
কত অঘ্রাণে নব নব ধানে
কতবার কত বোঝা ভরি',

কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে কত স্বর্ণভার,
কোন্ গ্রামে আজ সাধিতে কি কাজ
বাঁধিয়া ধরিলে তব তরী!

হেথা বিকিকিনি কার হাটে?
কেন এত ত্বরা লইয়া পসরা,
ছুটে চলে এরা কোন্ বাটে?
শুন গো থাকিয়া থাকিয়া
বোঝা লয়ে যায় হাঁকিয়া,
সে করুণ স্বরে মন কি যে করে
কি ভেবে আমার দিন কাটে!
কর্ণধার, হে কর্ণধার
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার,
হেথা কারা রয় লহ পরিচয়
কারা আসে যায় এই ঘাটে!

যেথা হতে যাই, যাই কেঁদে!
এমনটি আর পাব কি আবার
সরে না যে মন সেই খেদে!

সে সব কাঁদন ভুলালে,
কি দোলায় প্রাণ দুলালে ?
হোথা যারা তীরে আনমনে ফিরে
আমি তাহাদের মরি সেধে !
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার !
এই হাটে নামি' দেখে' লব আমি
এক বেলা তরী রাখ বেঁধে !

গান ধর' তুমি কোন্ সুরে !
মনে পড়ে' যায় দূর হতে এনু,
যেতে হবে পুনঃ কোন্ দূরে !
শুনে মনে পড়ে দু জনে
খেলেছি স্বজনে বিজনে,
সে যে কত দেশ নাহি তার শেষ
সে যে কতকাল এনু ঘুরে !
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার !
বাজিয়াছে শাঁখ, পড়িয়াছে ডাক
সে কোন্ অচেনা রাজপুরে !

স্বপ্নশেষ।

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই!
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই!
যা ছিল তা শেষ করেছি
একটি বসন্তেই!
আজ যা কিছু বাকি আছে
সামান্য এই দান
তাই নিয়ে কি রচি' দিব
একটি ছোট গান?
একটি ছোট মালা, তোমার
হাতের হবে বালা,
একটি ছোট ফুল, তোমার
কানের হবে দুল;
একটি তরুলতায় বসে
একটি ছোট খেলায়
হারিয়ে দিয়ে যাবে মোরে
একটি সন্ধে বেলায়!

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই!
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই!
ঘাটে আমি একলা বসে রই,
ওগো আয়!
বর্ষা-নদী পার হবি কি ওই?
হায় গো হায়!
অকূল মাঝে ভাস্‌বি কে গো
ভেলার ভরসায়?
আমার তরীখান
সৈবে না তুফান;
তবু যদি লীলাভরে
চরণ কর দান,
শান্ত তীরে তীরে, তোমায়
বাইব ধীরে ধীরে;
একটি কুমুদ তুলে, তোমার
পরিয়ে দিব চুলে।
ভেসে ভেসে শুন্‌বে বসে
কত কোকিল ডাকে

কূলে কূলে কুঞ্জবনে
নীপের শাখে শাখে।
ক্ষুদ্র আমার তরীখানি—সত্য করি' কই,
হায় গো পথিক হায়,
তোমায় নিয়ে একলা নায়ে পার হব না ওই
আকুল যমুনায়।

—০—

কূলে।

আমাদের এই নদীর কূলে
নাইক স্নানের ঘাট,
ধূধূ করে মাঠ।
ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু
শালিখ্ লাখে লাখে
খোপের মধ্যে থাকে।
সকাল বেলা অরুণ আলো
পড়ে জলের পরে,
নৌকা চলে দু'একখানি
অলস বায়ুভরে।
আঘাটাতে বসে রৈলে

বেলা যাচ্চে বয়ে ;—
দাও গো মোরে কয়ে'
ভাঙন-ধরা কূলে তোমার
আর কিছু কি চাই ?
সে কহিল, ভাই,
নাই, নাই, নাই গো আমার
কিছুতে কাজ নাই !
আমাদের এ নদীর কূলে
ভাঙা পাড়ির তল,
ধেনু খায় না জল।
দূরগ্রামের দু' একটি ছাগ
বেড়ায় চরি চরি
সারাদিবস ধরি'।
জলের পরে বেঁকে-পড়া
খেজুর-শাখা হতে
ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে।
ঘাসের পরে অশথতলে
যাচ্ছে বেলা বয়ে ;—
দাও আমারে কয়ে

আজ্‌কে এমন বিজন প্রাতে
আর কারে কি চাই?
সে কহিল, ভাই,
নাই, নাই, নাই গো আমার
কারেও কাজ নাই।

—০—

যাত্রী।

আছে, আছে স্থান!
একা তুমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান।
না হয় হবে ঘেঁসাঘেঁসি,
এমন কিছু নয় সে বেশী,
না হয় কিছু ভারি হবে
আমার তরীখান,—
তাই বলে কি ফিরবে তুমি?
আছে, আছে স্থান!

এস, এস নায়ে!
ধূলা যদি থাকে কিছু
থাক্‌ না ধূলা পায়ে!

তনু তোমার তনুলতা,
চোখের কোণে চঞ্চলতা,
সজলনীল-জলদবরণ
বসনখানি গায়ে!
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই
এস এস নায়ে!

যাত্রী আছে নানা!
নানা ঘাটে যাবে তারা
কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষণেকতরে
বস্‌বে আমার তরী 'পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে
মান্‌বে না মোর মানা!
এলে যদি তুমিও এস,
যাত্রী আছে নানা!

কোথা তোমার স্থান?
কোন্ গোলাতে রাখতে যাবে
একটি আঁটি ধান?

বল্‌তে যদি না চাও, তবে
শুনে আমার কি ফল হবে;
ভাব্‌ব বসে খেয়া যখন
করব অবসান—
কোন্‌ পাড়াতে যাবে তুমি,
কোথা তোমার স্থান!

—o—

দুই তীরে।

আমি ভালবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জ্জনে
চকাচকির ঘর।

যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশী সব
হাঁসের বসবাস।
কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু'একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধ্যেবেলায় ভিড়ে।

আমি ভালবাসি আমার
নদীর বালুচর
শরৎকালে যে নির্জ্জনে
চকাচকির ঘর।

২

তুমি ভালবাস তোমার
ঐ ওপারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুইধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি!
সকাল সন্ধ্যেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা,
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে, ভাসায় ভেলা।
তুমি ভালবাস তোমার
ঐ ওপারের বন,

যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

৩

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে এক(ই) গান সে
শোনায় নিরবধি।

আমি শুনি, শুয়ে
বিজন বালু-ভুঁয়ে,
তুমি শোন, কাঁখের কলস
ঘাটের পরে থুয়ে।
তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে,
আমার কূলে আরেক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী।
দুই তটেরে এক(ই) গান সে
শোনায় নিরবধি।

অতিথি ।

ঐ শোন গো অতিথ্ বুঝি আজ
এল আজ !
ওগো বধূ রাখ তোমার কাজ,
রাখ কাজ !

শুন্‌চ না কি তোমার গৃহদ্বারে
রিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে,
এমন ভরা সাঁঝ !
পায়ে পায়ে বাজিয়োনাক মল,
ছুটোনাক চরণ চঞ্চল,
হঠাৎ পাবে লাজ !

ঐ শোন গো অতিথ্ এল আজ,
এল আজ !
ওগো বধূ রাখ তোমার কাজ !
রাখ কাজ !

২

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয় !

ওগো বধূ মিছে কিসের ভয়,
মিছে ভয়!

আঁধার কিছু নাইক আঙিনাতে,
আজ্‌কে দেখ ফাগুন-পূর্ণিমাতে
আকাশ আলোময়!
না-হয় তুমি মাথার ঘোমটা টানি
হাতে নিয়ো ঘরের প্রদীপখানি,
যদি শঙ্কা হয়!

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়!
ওগো বধূ মিছে কিসের ভয়
মিছে ভয়!

না হয় কথা কোয়ো না তার সনে,
পান্থ সনে
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে!

প্রশ্ন যদি শুধায় কোন-কিছু
নীরব থেকো মুখটি করে নীচু
নম্র দু-নয়নে !
কাঁকণ যেন ঝঙ্কারে না হাতে,
পথ দেখিয়ে আন্‌বে যবে সাথে
অতিথি সজ্জনে !

না-হয় কথা কোয়োনা তার সনে,
পান্থ সনে !
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার কোণে !

৪

ওগো বধূ হয় নি তোমার কাজ ?
গৃহকাজ ?
ঐ শোন কে অতিথ্ এল আজ,
এল আজ !

সাজাওনি কি পূজারতির ডালা ?
এখনো কি হয় নি প্রদীপ জ্বালা
গোষ্ঠগৃহের মাঝ ?

অতি যত্নে সীমন্তটি চিরে
সিঁদুর-বিন্দু আঁক নাই কি শিরে ?
হয় নি সন্ধ্যাসাজ ?

ওগো বধূ হয় নি তোমার কাজ ?
গৃহ কাজ ?
ঐ শোন কে অতিথ্ এল আজ,
এল আজ !

—০—

বিলম্বিত।

অনেক হল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি !
তখন ছিল দখিন-হাওয়া
আধ্ ঘুমো আধ্ জাগা,
তখন ছিল শর্ষে ক্ষেতে
ফুলের আগুন লাগা ;
তখন আমি মালা গেঁথে
পদ্মপাতায় ঢেকে

পথে বাহির হয়েছিলেম
রুদ্ধ কুটীর থেকে।
অনেক হল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

২

বসন্তের সে মালা
আজ কি তেমন গন্ধ দেবে
নবীন সুধা-ঢালা?
আজকে বহে পূবে বাতাস,
মেঘে আকাশ জুড়ে,
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে
নব-নবাঙ্কুরে!
হাওয়ায় হাওয়ায় নাইক রে হায়
হাল্কা সে হিল্লোল,
নাই বাগানে হাস্যে গানে
পাগল গণ্ডগোল!
অনেক হল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

৩

হল কালের ভুল !
পূবে হাওয়ায় ধরে' দিলেম
দখিন হাওয়ার ফুল !
এখন এল অন্য সুরে
অন্য গানের পালা,
এখন গাঁথ অন্য ফুলে
অন্য ছাঁদের মালা !
বাজ্‌চে মেঘের গুরু গুরু,
বাদল ঝরঝর,
সজলবায়ে কদম্ববন
কাঁপচে থর থর !
অনেক হল দেরী,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি !

—০—

চিরায়মানা ।

যেমন আছ তেমনি এস,
আর কোরো না সাজ !

বেণী না হয় এলিয়ে রবে,
সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,
নাই বা হল পত্রলেখায়
সকল কারুকাজ!
কাঁচল যদি শিথিল থাকে
নাইক তাহে লাজ!
যেমন আছ তেম্‌নি এস,
আর কোরো না সাজ!

এস দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের পরে ফেলে!
ভয় কোরো না, অলক্তরাগ
মোছে যদি মুছিয়া যাক্‌,
নূপুর যদি খুলে পড়ে
না হয় রেখে এলে!
খেদ কোরো না, মালা হতে
মুক্তা খসে' গেলে!
এস দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের পরে ফেলে

হের গো ঐ আঁধার হল
আকাশ ঢাকে মেঘে!
ওপার হতে দলে দলে
বকের শ্রেণী উড়ে চলে,
থেকে থেকে শূন্য মাঠে
বাতাস ওঠে জেগে।
ঐরে গ্রামের গোষ্ঠ-মুখে
ধেনুরা ধায় বেগে!
হের গো ঐ আঁধার হ'ল,
আকাশ ঢাকে মেঘে!

প্রদীপখানি নিবে যাবে,
মিথ্যা কেন জ্বালো?
কে দেখ্‌তে পায় চোখের কাছে
কাজল আছে কি না আছে?
তরল তব সজল দিঠি
মেঘের চেয়ে কালো!
আঁখির পাতা যেমন আছে
এমনি থাকা ভালো!

কাজল দিতে প্রদীপখানি
মিথ্যা কেন জ্বালো?

এস হেসে সহজ বেশে
আর কোরো না সাজ!
গাঁথা যদি না হয় মালা,
ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,
ভূষণ যদি না হয় সারা
ভূষণে নাই কাজ!
মেঘে মগন পূর্ব্বগগন,
বেলা নাই রে আজ!
এস হেসে সহজবেশে
নাই বা হল সাজ!

—০—

যাত্রিণী।

মন্ত্রে সে যে পূত
রাখীর রাঙা সূতো,
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে,
আজ কি আছে সেটি সাথে?

বিদায়-বেলা এল মেঘের মত ব্যেপে,
গ্রন্থি বেঁধে দিতে দু'হাত গেল কেঁপে,
সেদিন থেকে থেকে চক্ষুদুটি ছেপে
ভরে' যে এল জলধারা।
আজ্‌কে বসে আছি পথের এক পাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে,
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে
ভ্রমর যেন পথহারা ;—
সেই যে বাম হাতে একটি সরু রাখী
আধেক রাঙা, সোনা আধা,
আজো কি আছে সেটি বাঁধা ?

পথ যে কতখানি
কিছুই নাহি জানি,
মাঠের গেছে কোন্ শেষে,
চৈত্র ফসলের দেশে !
যখন গেলে চলে 'তোমার গ্রীবামূলে
দীর্ঘ বেণী তব এলিয়ে ছিল খুলে',
মাল্যখানি গাঁথা সাঁজের কোন্ ফুলে
লুটিয়ে পড়েছিল পায়ে।

একটুখানি তুমি দাঁড়িয়ে যদি যেতে!
নতুন ফুলে দেখ কানন ওঠে মেতে,
দিতেম ত্বরা করে' নবীন মালা গেঁথে
কনকচাঁপা-বনছায়ে ।
মাঠের পথে যেতে তোমার মালাখানি
প'ল কি বেণী হতে খসে ?
আজকে ভাবি তাই বসে !

নূপুর ছিল ঘরে
গিয়েছ পায়ে পরে',
নিয়েছ হেথা হ'তে তাই,
অঙ্গে আর কিছু নাই ।
আকুল কলতানে শতেক রসনায়
চরণ ঘেরি' তব কাঁদিছে করুণায়,
তাহারা হেথাকার বিরহবেদনায়
মুখর করে তব পথ ।
জানি না কি এত যে তোমার ছিল ত্বরা,
কিছুতে হ'ল না যে মাথার-ভূষা পরা,
দিতেম খুঁজে এনে সিঁথিটি মনোহরা
রহিল মনে মনোরথ !

হেলায় বাঁধা সেই নূপুর দুটি পায়ে
আছে কি পথে গেছে খুলে,
সে কথা ভাবি তরুমূলে!

অনেক গীত গান
করেছি অবসান
অনেক সকালে ও সাঁজে
অনেক অবসরে কাজে!
তাহারি শেষ গান আধেক লয়ে কানে
দীর্ঘপথ দিয়ে গেছ সুদূর পানে,
আধেক জানা সুরে আধেক ভোলা তানে
গেয়েছ গুন্‌গুন্‌ স্বরে।
কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো,
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো,
ফুট্‌ল তব পূজা-তরে!
মাঠের কোন্‌খানে হারাল শেষ সুর,
যে গান নিয়ে গেলে শেষে
ভাবি সে তাই অনিমেষে!

—০—

আবির্ভাব।

বহুদিন হ'ল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায় ;
এলে তুমি ঘন বরষায় !
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে,
আজি নবঘন বিপুল মন্দ্রে
আমার পরাণে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায় !
আজি জলভরা বরষায় !

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
কনকাঞ্চল আবরণ,
নব-চম্পক আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চল-চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ !
কোথা চম্পক আভরণ !

সেদিন দেখেছি খণে খণে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,—
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল !
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনি রিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিশ্বাস-পরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল।

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া,
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল !
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়-সাগর-উপকূল ;
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে'
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার !

যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখেনি সে গানের সুর
এ ছোট বীণার ক্ষীণ তার ;
এ নহে তোমার উপহার !

কে জানিত সেই ক্ষণিকা মূরতি
দূরে করি দিবে বরষণ,
মিলাবে চপল দরশন ?
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ ?
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ !
বাসর-ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য বিরচন !
এ কি রূপে দিলে দরশন !

ক্ষমা কর তবে ক্ষমা কর মোর
আয়োজনহীন পরমাদ !
ক্ষমা কর যত অপরাধ !
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ-আলোকে এস ধীরে ধীরে

এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ !
ক্ষমা কর যত অপরাধ।

আস নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায়
এস এস ভরা বরষায় !
এস গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এস গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরাণ ভরি যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায় !
আজি জলভরা বরষায় !

—০—

নিরুদ্দেশ যাত্রা।

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরি ?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী ?
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী,

বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে
তোমার মনে?
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি',
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন-কোণে!
কি আছে হোথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে?

বল দেখি মোরে শুধাই তোমায়,
অপরিচিতা,—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্ম্মিমুখর সাগরের পার,

মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না বলে' !

হুহু করে' বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস !
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস !
সংশয়ময় ঘননীল নীর
কোন দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন ;
তারি পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি পরে পড়ে সন্ধ্যা-কিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন ?
আমি ত বুঝি না কি লাগি তোমার
বিলাস হেন ?

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
"কে যাবে সাথে ?"
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে ;
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম পানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে ?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না বলে' !

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো
শান্ত ছবি।

বেলা বহে' যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে' যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমির-তলে?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না বলে'!

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহ-সৌরভ,
শুধু কানে আসে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে, তব
কেশের রাশি।

বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
　　নিকটে আসি,"
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
　　নীরব হাসি!

———·◆·———

লোকালয়।

হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহ দুয়ারে—
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই,
মাঝে মাঝে তবু ভুলে যাই,
চেয়ে চেয়ে দেখি কে আসে কে যায়
কোথা হতে যায় কোথা রে !

কেহ নাহি চায় থামিতে !
শিরে লয়ে বোঝা চলে' যায় সোজা,
না চাহে দখিণে বামেতে !
বকুলের শাখে পাখী গায়,
ফুল ফুটে তব আঙিনায়,
না দেখিতে পায় না শুনিতে চায়,
কোথা যায় কোন্ গ্রামেতে !

বাঁশি লই আমি তুলিয়া।
তারা ক্ষণতরে পথের উপরে
বোঝা ফেলে' বসে ভুলিয়া !
আছে যাহা চিরপুরাতন
তারে পায় যেন হারাধন,
বলে, "ফুল এ কি ফুটিয়াছে দেখি !
পাখী গায় প্রাণ খুলিয়া !"

হে রাজন্‌, তুমি আমারে
রেখো চিরদিন বিরামবিহীন
তোমার সিংহদুয়ারে !
যারা কিছু নাহি কহে' যায়,
সুখ-দুখ-ভার বহে' যায়,
তারা ক্ষণতরে বিস্ময়ভরে
দাঁড়াবে পথের মাঝারে
তোমার সিংহদুয়ারে !



লোকালয়।

স্বর্গ হইতে বিদায়।

ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্ব্বাপিত জ্যোতির্ম্ময় টীকা
মলিন ললাটে ;—পুণ্যবল হল ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন,
হে দেব হে দেবীগণ! বর্ষ লক্ষশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মত
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল! শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে; লক্ষ লক্ষ বর্ষ তার
চক্ষের পলক নহে ;—অশ্বত্থশাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা

স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শত শত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মত
মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হ'তে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে।
সে বেদনা বাজিত যদ্যপি, বিরহের
ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের
চিরজ্যোতি ম্লান হ'ত মর্ত্ত্যের মতন
কোমল শিশিরবাষ্পে ;—নন্দনকানন
মর্ম্মরিয়া উঠিত নিশ্বসি', মন্দাকিনী
কূলে কূলে গেয়ে যেত করুণ কাহিনী
কলকণ্ঠে, সন্ধ্যা আসি দিবা-অবসানে
নির্জ্জন প্রান্তর পারে দিগন্তের পানে
চলে যেত উদাসিনী, নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লীমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্য-সঙ্গীত
নক্ষত্র-সভায়! মাঝে মাঝে সুরপুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনক নূপুরে
তালভঙ্গ হ'ত। হেলি' উর্ব্বশীর স্তনে
স্বর্ণবীণা থেকে থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ ঝঙ্কারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্চ্ছনা! দিত দেখা

দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা
নিষ্কারণে! পতিপাশে বসি একাসনে
সহসা চাহিত শচী ইন্দ্রের নয়নে
যেন খুঁজি পিপাসার বারি! ধরা হতে
মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি' আসিত বায়ুস্রোতে
ধরণীর সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস, খসি' ঝরি'
পড়িত নন্দনবনে কুসুমমঞ্জরী!—

থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু'দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু'দণ্ডের তরে!
যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপী তাপী, মেলি' ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক্ অমৃত,
মর্ত্তে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত

প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি !
হে অপ্সরি,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক্ ম্লান—লইনু বিদায় ;
তুমি কারে কর না প্রার্থনা—কারো তরে
নাহি শোক ! ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নতনয়নে
চন্দনচর্চ্চিতভালে রক্তপট্টাম্বরে,

উৎসবের বাঁশরী-সঙ্গীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দ্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্ত-সীমায় মঙ্গল সিন্দুর বিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে! দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূর স্বপ্ন সম—যবে কোনো অর্দ্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি' নির্ম্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি'
গ্রন্থি সরমের;—মৃদু সোহাগ চুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর—দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

অয়ি দীনহীনা,
অশ্রুআঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্তভূমি! আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।

যেমনি বিদায়দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ
অশ্রুতে পূরিল—অমনি এ স্বর্গলোক
অলস কল্পনা প্রায় কোথায় মিলালো
ছায়াচ্ছবি! তব নীলাকাশ, তব আলো,
তব জনপূর্ণ লোকালয়—সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে
শুভ্রহিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা,—বিন্দু অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
পড়েছে আসিয়া।

হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি' পড়ি' তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত—আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে; তবু জানি মনে
যখনি ফিরিব পুনঃ তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে

তব গেহে, তব পুত্র কন্যার মাঝারে,
আমারে লইবে চিরপরিচিত সম ;—
তার পর দিন হতে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি রবে কম্পমান প্রাণে,
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্দ্ধে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি—চিন্তিত সদাই
যাহারে পেয়েছি তারে কখন্ হারাই !

—০—

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই !
ধরায় প্রাণের খেলা চির-তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসিঅশ্রুময়,—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয় !
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,

তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই!
হাসিমুখে নিও ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিও ফুল যদি সে ফুল শুকায়!

—০—

খেলা।

হোক্ খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দ-কল্লোলাকুল নিখিলের সনে!
সব ছেড়ে মৌন হয়ে কোথা বসে র'বে
আপনার অন্তরের অন্ধকার কোণে!
জেনো মনে শিশু তুমি এ বিপুল ভবে
অনন্ত কালের কোলে, গগন-প্রাঙ্গণে;
যত জান মনে কর কিছুই জান না,
বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহ তুলি'
বর্ণগন্ধগীতময় যে মহা খেলনা
তোমারে দিয়াছে মাতা; হয় যদি ধূলি
হোক্ ধূলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা!
থেকো না অকালবৃদ্ধ বসিয়া একেলা,
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা!

বন্ধন।

বন্ধন ? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন
স্নেহপ্রেম আশাতৃষ্ণা ; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি',
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি' মন
সদা করাইছে পান ! স্তন্যের পিপাসা
কল্যাণদায়িনীরূপে থাকে শিশুমুখে—
তেমনি সহজ তৃষ্ণা আশা ভালবাসা
সমস্ত বিশ্বের রস কত দুঃখে সুখে
করিতেছে আকর্ষণ ! জনমে জনমে
প্রাণে মনে পূর্ণ করি গঠিতেছে ক্রমে
দুর্লভ জীবন ; পলে পলে নব আশ
নিয়ে যায় নব নব আস্বাদে আশ্রমে।
স্তন্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ
ছিন্ন করিবারে চাস্ কোন্ মুক্তিভ্রমে !

—০—

গতি।

জানি আমি সুখে দুঃখে হাসি ও ক্রন্দনে
পরিপূর্ণ এ জীবন, কঠোর বন্ধনে

ক্ষতচিহ্ন পড়ে' যায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে,
জানি আমি সংসারের সমুদ্র মন্থিতে
কারো ভাগ্যে সুধা ওঠে, কারো হলাহল ;-
জানি না কেন এ সব, কোন্ ফলাফল
আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম-শৃঙ্খলায়,—
জানি না কি হবে পরে, সবি অন্ধকার
আদি অন্ত এ সংসারে ; নিখিল দুঃখের
অন্ত আছে কি না আছে, সুখ-বুভুক্ষের
মিটে কি না চির-আশা ! পণ্ডিতের দ্বারে
চাহি না এ জনম-রহস্য জানিবারে !
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটী প্রাণী সাথে এক গতি মোর !

—o—

মুক্তি।

চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি,
বিমুখ হইয়া সর্ব্ব জগতের পানে,
শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি
মুক্তি আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে !
পার্শ্ব দিয়ে ভেসে যাবে বিশ্ব মহাতরী
অম্বর আকুল করি যাত্রীদের গানে,

শুভ্র কিরণের পালে দশদিক্ ভরি',
বিচিত্র সৌন্দর্য্যে পূর্ণ অসংখ্য পরাণে!
ধীরে ধীরে চলে যাবে দূর হতে দূরে
অখিল ক্রন্দন হাসি আঁধার আলোক,
বহে যাবে শূন্যপথে সকরুণ সুরে
অনন্ত জগৎভরা যত দুঃখ শোক!
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে র'ব মুক্তি-সমাধিতে?

—০—

অক্ষমা।

যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার,
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর!
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখদুঃখভার
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।
অসীম ঐশ্বর্য্যরাশি নাই তোর হাতে
হে শ্যামলা সর্ব্বসহা জননী মৃণ্ময়ী!
সকলের মুখে অন্ন চাহিস্ যোগাতে,
পারিস্ নে কতবার,—কই অন্ন কই
কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ;—
জানি মাগো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ,

যা-কিছু গড়িয়া দিস্ ভেঙে ভেঙে যায়,
সব-তা'তে হাত দেয় মৃত্যু সর্ব্বভুক্ ।
সব আশা মিটাইতে পারিস্‌নে হায়
তা বলে' কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক !

—০—

দরিদ্রা ।

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভাল লাগে,
বেদনা-কাতর মুখে সকরুণ হাসি
দেখে মোর মর্ম্ম মাঝে বড় ব্যথা জাগে !
আপনার বক্ষ হতে রস রক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিস্ সন্তানের দেহে,
অহর্নিশ মুখে তার আছিস্ তাকিয়ে,
অমৃত নারিস্ দিতে প্রাণপণ স্নেহে !
কত যুগ হতে তুই বর্ণ গন্ধ গীতে
সৃজন করিতেছিস্ আনন্দ আবাস,
আজো শেষ নাহি হল দিবসে নিশীথে,
স্বর্গ নাই, রচেছিস্ স্বর্গের আভাস !
তাই তোর মুখখানি বিষাদ-কোমল,
সকল সৌন্দর্য্যে তোর ভরা অশ্রুজল !

আত্মসমর্পণ।

তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দুয়েকটি প্রীতি-সুমধুর
অন্তরের ছন্দোগাথা ; দুঃখের ক্রন্দনে
বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদ-বিধুর
তোমার কণ্ঠের সনে ; কুসুমে চন্দনে
তোমারে পূজিব আমি ; পরাব সিন্দূর
তোমার সীমন্তে ভালে ; বিচিত্র বন্ধনে
তোমারে বাঁধিব আমি ; প্রমোদ-সিন্ধুর
তরঙ্গেতে দিব দোলা নব ছন্দে তানে !
মানব আত্মার গর্ব্ব আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখপানে,
ভালবাসিয়াছি আমি ধূলি মাটি তোর !
জন্মেছি যে মর্ত্ত্য কোলে, ঘৃণা করি' তা'রে
ছুটিবনা স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে !

—০—

কুহুধ্বনি।

প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনল-শ্বসনা,

অন্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা
মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।
ছায়ায় কুটীরখানা দু'ধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীসম করিছে বিরাজ ;
তারি তলে সবে মিলি,' চলিতেছে নিরিবিলি
সুখে দুঃখে দিবসের কাজ।
কোথা হতে নিদ্রাহীন রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিন
কোকিল গাহিছে কুহুস্বরে।
সেই পুরাতন তান প্রকৃতির মর্ম্মগান
পশিতেছে মানবের ঘরে।
নিখিল করিছে মগ্ন জড়িত মিশ্রিত ভগ্ন
গীতহীন কলরব কত,
পড়িতেছে তারি 'পর পরিপূর্ণ সুধাস্বর
পরিস্ফুট পুষ্পটির মত।
এত কাণ্ড, এত গোল, বিচিত্র এ কলরোল
সংসারের আবর্ত্ত-বিভ্রমে,
তবু সেই চিরকাল অরণ্যের অন্তরাল
কুহুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।
যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী,

যেন সেই রূপবতী সঙ্গীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি'।
সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে ;
জটিল সে ঝঞ্ঝনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্য্যের সরল সঙ্গীতে।
তাই ওই চিরদিন ধ্বনিতেছে শ্রান্তিহীন
কুহুতান, করিছে কাতর ;
সঙ্গীতের ব্যথা বাজে, মিশিয়াছে তার মাঝে
করুণার অনুনয় স্বর।
কেহ বসে গৃহ মাঝে, কেহ বা চলেছে কাজে,
কেহ শোনে, কেহ নাহি শোনে,
তবুও সে কি মায়ায় ওই ধ্বনি থেকে যায়
বিশ্বব্যাপী মানবের মনে।
তবু যুগ যুগান্তর মানবজীবনস্তর
ওই গানে আর্দ্র হয়ে আসে ;
কত কোটি কুহুতান মিশায়েছে নিজ প্রাণ
জীবের জীবন-ইতিহাসে।
সুখে দুঃখে উৎসবে গান উঠে কলরবে
বিরল গ্রামের মাঝখানে,

তারি সাথে সুধাস্বরে নিশে ভালবাসাভরে
পাখী গানে মানবের গানে।
কোজাগর পূর্ণিমায় শিশু শূন্যে হেসে চায়,
ঘিরে হাসে জনক জননী,
সুদুর বনান্ত হ'তে দক্ষিণ সমীর স্রোতে
ভেসে আসে কুহুকুহুধ্বনি।
প্রচ্ছায় তমসাতীরে শিশু কুশলব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে,
ঘন সহকারশাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে,
কুহুতানে করুণা বরিষে।
লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থরথর,
তখন সে কুহুভাষা রমণীর ভালবাসা
করেছিল সুমধুরতর।
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই,
শুনিয়া আকুল কুহুরব,
বিশাল মানব প্রাণ মোর মাঝে বর্ত্তমান,
দেশ কাল করি অভিভব।
অতীতের দুঃখ সুখ, দূরবাসী প্রিয় মুখ,
শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান,

ওই কুহুমন্ত্র বলে জাগিতেছে দলে দলে
লভিতেছে নূতন পরাণ।

—০—

পুরাতন।

হেথা হতে যাও, পুরাতন!
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।
কি জানি কত কি আশে চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে।
সবাই ত ভুলে আছে—কেহ হাসে কেহ নাচে,
—তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে!
বাতাস যেতেছে বহি' তুমি কেন রহি' রহি'
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস;
সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল' আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস।
উঠিছে প্রভাত রবি, আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া!
বারেক যে চলে যায়, তারেত কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া!

তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
লুকায়ে, ধরার পানে চায়—
নিশীথের অন্ধকারে পুরাণো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়!
কি দেখিতে আসিয়াছ! যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন!
স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত
ঝরে-পড়া পাতার মতন!
আজি বসন্তের বায় এককটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতি দিন;
ধূলিতে মাটিতে রহি' হাসির কিরণে দহি'
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন!
ঢাক তবে ঢাক মুখ নিয়ে যাও সুখ দুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে।
হেথায় আলয় নাহি; অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে!

নূতন।

হেথাও ত পশে সূর্য্যকর!
ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনি পাতে
বিদারিল যে গিরি-শিখর—

বিশাল পর্ব্বত কেটে, পাষাণ-হৃদয় ফেটে,
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—
প্রভাতে পুলকে ভাসি, বহিয়া নবীন হাসি
হেথাও ত পশে সূর্য্যকর !
দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে ত যায় না সে রে,
শিহরি উঠে না আশঙ্কায়,
ভাঙা পাষাণের বুকে খেলা করে কোন্ সুখে,
হেসে আসে, হেসে চলে যায় !
বিষাদ বিপুল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া
তারে এরা করে না ত ভয়,
চারি দিক হতে তারে ছোট ছোট হাসি মারে,
অবশেষে করে পরাজয়।

এই যে রে মরুস্থল, দাব-দগ্ধ ধরাতল,
এই খানে ছিল "পুরাতন",
এক দিন ছিল তার শ্যামল যৌবন ভার,
ছিল তার দক্ষিণ-পবন।
যদি রে সে চলে গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,

শুষ্ক-স্মৃতি কেন মিছে   রেখে তবে গেল পিছে,
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল !
সে কি চায় শুষ্ক বনে   গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন ?
আগেকার মত করে   স্নেহে তার নাম ধরে
উচ্ছ্বসিবে বসন্ত পবন ?
নহে নহে, সে কি হয় !   সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয়রে, নূতন, আয়,   সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ দুঃখ হাসি গান।
ফোটা' নব ফুল চয়,   ওঠা' নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।
যে যায় সে চলে যাক্,   সব তার নিয়ে যাক্,
নাম তার যাক্ মুছে দিয়ে।
এ কি ঢেউ-খেলা হায়,   এক আসে আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান   না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি !
আয়রে কাঁদিয়া লই,   শুকাবে দু' দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারি ধারা।

সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোট ছোট সুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।

—০—

বৈষ্ণব-কবিতা।

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে,—এ কি শুধু দেবতার?
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা?
এ গীত-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে;—
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি' শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান,—দূর হ'তে তাই শুনে'

তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি' উঠে ; শুনি' সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা ;—মধুময় হ'য়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটি ছুটে,
মোদের কুটীর-প্রান্তে যে কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে ;—সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি মোর বামবাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর, হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালবাসা ;
ওই গানে যদি বা সে পায় নিজভাষা,—
যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি,
তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি !
সত্য করে' কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে

কে তোমারে বেঁধেছিল ছুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে! আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে! তারি নারী-হৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন!
আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ! এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়!
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!

—০—

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন;
চারি দিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন!
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ ভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,

চোখের উপরে পড়িতেছে
　　মরীচিকা-ছবির মতন!
হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কঙালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
　　তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মার মায়া পায়নি কখনো,
　　মা কেমন দেখিতে এসেছে!
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
　　বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা!
চেয়ে যেন মার মুখ পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
　　বলে,—"মা গো এ কেমন ধারা!
এত বাঁশী এত হাসিরাশি,
　　এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
　　মোর কেন মলিন বসন!"
ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি
ভাই বোন করি গলাগলি,
　　অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই;

বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে
"আমি ত ওদের কেহ নই!
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে ত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে করে' নিয়ে
মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন!"
আপনার ভাই নেই বলে'
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ!
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ!
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে!

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!

দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
　　ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার শাখা
　　তবে মিছে মঙ্গল কলস!

—০—

যেতে নাহি দিব।

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর;
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্ন বাতাসে; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি'
ঘুমায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম;—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আশ্বিন।—পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহু দূর দেশে
সেই কর্ম্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিষপত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাকি ডাকাডাকি এঘরে ওঘরে।

ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার !
তাকান্থ ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিন্থ প্রেয়ার মুখে ; কহিলাম ধীরে
"তবে আসি"। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষুপরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের ; এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে ; আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে ; এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁসে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্ণিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্ত দেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কি জানি কি ভেবে

চুপিচাপি বসেছিল। কহিনু যখন
"মাগো, আসি," সে কহিল বিষণ্ণ নয়ন
ম্লান মুখে "যেতে আমি দিব না তোমায়!"
যেখানে আছিল বসে' রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল—"যেতে আমি দিব না তোমায়!"
তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল!

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে!
কে রে তুই, কোথা হতে কি শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্দ্ধাভরে—
"যেতে আমি দিব না তোমায়!" চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে' দুটি ছোট হাতে,
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ!
ব্যথিত হৃদয় হতে বহুভয়ে লাজে
মর্ম্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে,—শুধু বলে রাখা "যেতে দিতে

ইচ্ছা নাহি," হেন কথা কে পারে বলিতে
"যেতে নাহি দিব!" শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ব্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে' নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভোরে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন,
আমি দেখে' চলে' এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুইধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে। জল স্থল হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি'
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন

বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে'
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু ত রে
শিথিল হল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মত
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্ব্বে কহিছে সে ডাকি
"যেতে নাহি দিব"; ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,—
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কয়
"যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়
ততবার কহে—"আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে!
আমার আকাঙ্ক্ষাসম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর!"
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
"যেতে নাহি দিব!"—তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে' চলে' যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন,—
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,

ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব্ব নতশির।—তবু প্রেম বলে
"সত্য ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি!" তাই স্ফীতবুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে "মৃত্যু তুমি নাই।"—হেন গর্ব্বকথা!

আজি আমি শুনিতেছি তরুর মর্ম্মরে
আর্ত্ত ব্যাকুলতা; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে; বেলা ধীরে যায় চলে'
ছায়া দীর্ঘতর করি' অশথের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল

দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্ম্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত।

—০—

শৈশব সন্ধ্যা।

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি' চারিধার
শ্রান্তি, আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকার,
মায়ের অঞ্চলসম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিম পানে অনিমেষ আঁখি
স্তব্ধ চেয়ে আছি; আপনারে মগ্ন করি'
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি'
জীবনের মাঝে—আজিকার এই ছবি,
জনশূন্য নদীতীর, অস্তগামী রবি,
ম্লান মূর্চ্ছাতুর আলো—রোদন-অরুণ
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন,—এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাদ।
সহসা উঠিল গাহি' কোন্‌খান্ হতে
বন-অন্ধকারঘন কোন্ গ্রামপথে

যেতে যেতে গৃহমুখী বালক পথিক।
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক
কাঁপিছে সপ্তম সুরে; তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দু'খান।
দেখিতে না পাই তারে; ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্ব্ব প্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,
আখের ক্ষেতের পারে, কদলী সুপারি,
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম,—হোথা আঁখি ধায়।
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে' যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু।

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা
শৈশবের; কত গল্প কত বাল্যখেলা,
এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন;
সে কি আজিকার কথা, হল কত দিন!
এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায় নি সংসার!
ভোলে নাই খেলাধূলা, নয়নে তাহার

আসে নাই নিদ্রাবেশ শান্ত সুশীতল,
বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল
পায় নি কঠিন জ্ঞান! দাঁড়ায়ে হেথায়
নির্জ্জন মাঠের মাঝে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
শুনিয়া কাহার গান পড়ি' গেল মনে
কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,
কাংস্যঘণ্টামুখরিত মন্দিরের ধারে,
কত শস্যক্ষেত্রপ্রান্তে, পুকুরের পাড়ে
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,
নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ,
কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,
অনন্ত বিশ্বাস। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি' বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

—o—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

দিনের আলো নিবে এল, সূর্য্যি ডোবে ডোবে,
আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে চাঁদের লোভে লোভে।

মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রং,
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও পারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্‌ টুপুর্‌ নদী এল বান।"

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা কোথায় বা সীমানা!
দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়!
পলে পলে নতুন খেলা কোথায় ভেবে পায়!
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে!
কত দিনের লুকোচুরী কত ঘরের কোণে!
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্‌ টুপুর্‌ নদী এল বান।"

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের 'পরে দৌরাত্ম্যি সে না যায় লেখাজোকা।

ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বান।"

মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা,
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারিদিকে দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে একেবারে চুপ্।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘ্‌লা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বান।"

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বান এল সে কোথা!
শিবুঠাকুরের বিয়ে হল কবেকার সে কথা;
সে দিনো কি এম্‌নিতর মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বিজুলী কি দিতেছিল হানা?
তিন কন্যে বিয়ে করে' কি হল তার শেষে!
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে,

কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাইল গান-
"বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বান।"

—০—

প্রৌঢ়।

যৌবননদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে
এক দিন ছুটেছিনু ; বসন্তপবন
উঠেছিল উচ্ছ্বসিয়া ;—তীর-উপবন
ছেয়েছিল কুসুমকুলে ;—তরুশাখা পরে
গেয়েছিল পিককুল,—আমি ভাল করে'
দেখি নাই শুনি নাই কিছু—অনুক্ষণ
দুলেছিনু আলোড়িত তরঙ্গশিখরে
মত্ত সন্তরণে। আজ দিবা অবসানে
সমাপ্ত করিয়া খেলা উঠিয়াছি তীরে
বসিয়াছি আপনার নিভৃত কুটীরে,—
বিচিত্র কল্লোলগীত পশিতেছে কানে,—
কত গন্ধ আসিতেছে সায়াহ্ন সমীরে ;
বিস্মিত নয়ন মেলি হেরি শূন্য পানে
গগনে অনন্তলোক জাগে ধীরে ধীরে।

—০—

ধূলি।

অয়ি ধূলি, অতি তুচ্ছ, অয়ি দীনহীনা,
সকলের নিম্নে থাক নীচতম জনে
বক্ষে বাঁধিবার তরে ;—সহি' সর্ব্ব ঘৃণা
কারে নাহি কর ঘৃণা। গৈরিক বসনে
হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি' উদাসীনা,
বিশ্বজনে পালিতেছ আপন ভবনে।
নিজেরে গোপন করি' অয়ি বিমলিনা,
সৌন্দর্য্য বিকাশ' তোল বিশ্বের নয়নে ;—
বিস্তারিছ কোমলতা, হে শুষ্ক কঠিনা,
হে দরিদ্রা, পূর্ণা তুমি রত্নে ধান্যে ধনে !
হে আত্মবিস্মৃতা, বিশ্ব-চরণ-বিলীনা,
বিস্মৃতেরে ঢেকে রাখ অঞ্চল বসনে।
নূতনেরে নির্ব্বিচারে কোলে লহ তুলি;
পুরাতনে বক্ষে ধর, হে জননী ধূলি !

—:—

দেবতার বিদায়।

দেবতা-মন্দিরমাঝে ভকত প্রবীন
জপিতেছে জপমালা বসি' নিশিদিন।

হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতর কণ্ঠে—"গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই!"
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে
"আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে!"
সে কহিল "চলিলাম"—চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্ত্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে!"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি' দিলে!
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে!"

—:—

পুণ্যের হিসাব।

সাধু যবে স্বর্গে গেল, চিত্রগুপ্তে ডাকি'
কহিলেন, "আন মোর পুণ্যের হিসাব!"
চিত্রগুপ্ত খাতাখানি সম্মুখেতে রাখি'
দেখিতে লাগিল তার মুখের কি ভাব।
সাধু কহে চমকিয়া, "মহা ভুল এ কি!
প্রথমের পাতাগুলো ভরিয়াছ আঁকে,

শেষের পাতায় এ যে সব শূন্য দেখি।
যত দিন ডুবে' ছিনু সংসারের পাঁকে
তত দিন এত পুণ্য কোথা হ'তে আসে!"—
শুনি' কথা চিত্রগুপ্ত মনে মনে হাসে।
সাধু মহা রেগে' বলে—"যৌবনের পাতে
এত পুণ্য কেন লেখ দেবপূজা খাতে!"
চিত্রগুপ্ত হেসে বলে—"বড় শক্ত বুঝা!
যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা!"

—:—

বৈরাগ্য।

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী—
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি'।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে!"
দেবতা কহিলা "আমি!"—শুনিল না কানে!
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল—"কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা!"
দেবতা কহিলা "আমি!" কেহ শুনিল না!
ডাকিল শয়ন ছাড়ি'—"তুমি কোথা প্রভু!"—
দেবতা কহিলা—"হেথা!"—শুনিল না তবু!

স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি',—
দেবতা কহিলা "ফির!"—শুনিল না বাণী!
দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন—"হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!"

—:—

পল্লীগ্রামে।

হেথায় তাহারে পাই কাছে,
যত কাছে ধরাতল, যত কাছে ফুলফল,
যত কাছে বায়ু জল আছে।
যেমন পাখীর গান, যেমন জলের তান,
যেমনি এ প্রভাতের আলো,
যেমন এ কোমলতা, অরণ্যের শ্যামলতা,
তেমনি তাহারে বাসি ভালো।
যেমন সুন্দর সন্ধ্যা, যেমন রজনীগন্ধা,
শুকতারা আকাশের ধারে,
যেমন সে অকলুষা শিশির-নির্ম্মলা উষা
তেমনি সুন্দর হেরি তারে।
যেমন বৃষ্টির জল, যেমন আকাশ তল,
সুখসুপ্তি যেমন নিশার,

যেমন তটিনীনীর, বটচ্ছায়া অটবীর
তেমনি সে মোর আপনার।
যেমন নয়ন ভরি' অশ্রুজল পড়ে ঝরি'
তেমনি সহজ মোর গীতি,
যেমন রয়েছে প্রাণ ব্যাপ্ত করি মর্ম্ম স্থান
তেমনি রয়েছে তার প্রীতি।

—ঃ—

সামান্য লোক।

সন্ধ্যাবেলা লাঠি কাঁখে বোঝা বহি' শিরে
নদীতীরে পল্লীবাসী ঘরে যায় ফিরে।
শত শতাব্দীর পরে যদি কোন মতে
মন্ত্রবলে, অতীতের মৃত্যুরাজ্য হ'তে
এই চাষী দেখা দেয় হয়ে মূর্ত্তিমান
এই লাঠি কাঁখে লয়ে, বিস্মিত নয়ান!
চারিদিকে ঘিরি তারে অসীম জনতা
কাড়াকাড়ি করি' লবে তার প্রতি কথা।
তার সুখ দুঃখ যত তার প্রেম স্নেহ,
তার পাড়া প্রতিবেশী, তার নিজ গেহ,
তার ক্ষেত, তার গোরু, তার চাষবাস,
শুনে শুনে কিছুতেই মিটিবেনা আশ।

আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সে দিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম

প্রভাত।

নির্ম্মল তরুণ উষা, শীতল সমীর,
শিহরি শিহরি উঠে শান্ত নদীনীর।
এখনো নামেনি জলে রাজহাঁসগুলি,
এখনো ছাড়েনি নৌকা শাদা পাল তুলি';
এখনো গ্রামের বধূ আসে নাই ঘাটে,
চাষী নাহি চলে পথে, গোরু নাহি মাঠে।
আমি শুধু একা বসি' মুক্ত বাতায়নে
তপ্ত ভাল পাতিয়াছি উদার গগনে।
বাতাস সোহাগস্পর্শ বুলাইছে কেশে,
প্রসন্ন কিরণ খানি মুখে পড়ে এসে।
পাখীর আনন্দগান দশদিক্ হতে
দুলাইছে নীলাকাশ অমৃতের স্রোতে।
ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো,
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো!

দুর্লভ জন্ম।

একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়ন'পরে অন্তিম নিমেষ।
পরদিনে এই মত পোহাইবে রাত,
জাগ্রত জগত'পরে জাগিবে প্রভাত।
কলরবে চলিবেক সংসারের খেলা,
সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে বহি যাবে বেলা।
সে কথা স্মরণ করি' নিখিলের পানে
আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে!
যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।
যা পাইনি তাও থাক্, যা পেয়েছি তাও।
তুচ্ছ বলে' যা চাইনি তাই মোরে দাও!

—o—

খেয়া।

খেয়া নৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব কত সর্ব্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস;
রক্ত প্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে'
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে!
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা,
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা।
শুধু হেথা দুই তীরে—কেবা জানে নাম—
দোঁহা পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম!
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে কেহ আসে ঘর হতে!

—০—

কর্ম্ম।

ভৃত্যের না পাই দেখা প্রাতে!
দুয়ার রয়েছে খোলা, স্নানজল নাই তোলা,
মূর্খাধম আসে নাই রাতে।
মোর ধৌত বস্ত্রখানি কোথা আছে নাহি জানি,
কোথা আহারের আয়োজন,

বাজিয়া যেতেছে ঘড়ি, বসে আছি রাগ করি'
দেখা পেলে করিব শাসন।
বেলা হলে অবশেষে প্রণাম করিল এসে
দাঁড়াইল করি করযোড়,
আমি তারে রোষ ভরে কহিলাম "দূর হ' রে
দেখিতে চাহিনে মুখ তোর!"
শুনিয়া মূঢ়ের মত ক্ষণকাল বাক্যহত
মুখে মোর রহিল সে চেয়ে,
কহিল গদ্গদ স্বরে— "কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে
মারা গেছে মোর ছোট মেয়ে!"
এত কহি' ত্বরা করি' গামোছাটি কাঁধে ধরি'
নিত্য কাজে গেল সে একাকী।
প্রতি দিবসের মত ঘষামাজা মোছা কত
কোন কর্ম্ম রহিল না বাকী!

—০—

বনে ও রাজ্যে।

সারাদিন কাটাইয়া সিংহাসন পরে
সন্ধ্যায় পশিলা রাম শয়নের ঘরে।
শয্যার আধেক অংশ শূন্য বহুকাল,
তারি পরে রাখিলেন পরিশ্রান্ত ভাল,—

দেবশূন্য দেবালয়ে ভক্তের মতন
বসিলেন ভূমি পরে সজল নয়ন,
কহিলেন নতজানু কাতর নিঃশ্বাসে—
যতদিন দীনহীন ছিনু বনবাসে
নাহি ছিল স্বর্ণ মণি মাণিক্য মুকতা,
তুমি সদা ছিলে লক্ষ্মী প্রত্যক্ষ দেবতা।
আজি আমি রাজেশ্বর, তুমি নাই আর,
আছে স্বর্ণ মাণিক্যের প্রতিমা তোমার!
নিত্যসুখ দীন বেশে বনে গেল ফিরে,
স্বর্ণময়ী চিরব্যথা রাজার মন্দিরে!

—০—

সাগর-মন্থন।

হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে
কে তোমারে আন্দোলিছে বিরাট্ মন্থনে
অনন্ত বরষ ধরি'! দেব-দৈত্যদলে
কি রত্ন সন্ধান লাগি' তোমার অতলে
অশান্ত আবর্ত্ত নিত্য রেখেছে জাগায়ে
পাপে পুণ্যে সুখে দুঃখে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
ফেনিল কল্লোলভঙ্গে? ওগো দাও দাও
কি আছে তোমার গর্ভে—এ ক্ষোভ থামাও!

তোমার অন্তর লক্ষ্মী যে শুভপ্রভাতে
উঠিবেন অমৃতের পাত্র বহি' হাতে
বিস্মিত ভুবন মাঝে,—লয়ে বরমালা
ত্রিলোক নাথের কণ্ঠে পরাবেন বালা,
সে দিন হইবে ক্ষান্ত এ মহা মন্থন,
থেমে যাবে সমুদ্রের রুদ্র এ ক্রন্দন।

—০—

দিদি।

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমী মজুর। তাহাদের ছোট মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা; কত ঘষামাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে,—আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেকবার; পিত্তল কঙ্কণ
পিত্তলের থালি পরে বাজে ঠন্‌ঠন্;—
বড় ব্যস্ত সারাদিন, তারি ছোট ভাই
নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই
পোষা প্রাণীটির মত পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চপাড়ে দিদির আদেশে
স্থির ধৈর্য্যভরে! ভরাঘট লয়ে মাথে
বামকক্ষে থালি, যায় বালা ডানহাতে

ধরি শিশুকর ; জননীর প্রতিনিধি,
কর্ম্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি ।

—০—

পরিচয় ।

একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলিপরে বসে আছে পা দু'খানি মেলে ।
ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়া'য়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে ।
অদূরে কোমল-লোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল নদী তীরে তীরে ।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া !
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটে চলে আসে ।
এক কক্ষে ভাই লয়ে অন্য কক্ষে ছাগ
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ ।
পশুশিশু, নরশিশু,—দিদি মাঝে পড়ে'
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়-ডোরে ।

অনন্ত পথে।

বাতায়নে বসি ওরে হেরি প্রতিদিন
ছোট মেয়ে খেলাহীন, চপলতাহীন,
গম্ভীর কর্ত্তব্যরত,—তৎপর-চরণে
আসে যায় নিত্যকাজে; অশ্রুভরা মনে
ওর মুখপানে চেয়ে হাসি স্নেহভরে।
আজি আমি তরী খুলি' যাব দেশান্তরে;
বালিকাও যাবে কবে কর্ম্ম অবসানে
আপন স্বদেশে; ও আমারে নাহি জানে,
আমিও জানিনে ওরে; দেখিবারে চাহি
কোথা ওর হবে শেষ জীবসূত্র বাহি'।
কোন্ অজানিত গ্রামে, কোন্ দূর দেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে;
তার পরে সব শেষ,—তারো পরে; হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়।



ক্ষণ-মিলন।

পরম আত্মীয় বলে যারে মনে মানি
তারে আমি কত দিন কতটুকু জানি!

অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে
পরশে জীবন তার আমার জীবনে।
যতটুকু লেশমাত্র চিনি দুজনায়,
তাহার অনন্তগুণ চিনিনাকো হায়।
দুজনের একজন একদিন যবে
বারেক ফিরাবে মুখ, এ নিখিল ভবে
আর কভু ফিরিবে না মুখামুখী পথে,
কে কার পাইবে সাড়া অনন্ত জগতে।
এ ক্ষণ-মিলনে তবে, ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর!
মুহূর্ত্ত আলোকে কেন, হে অন্তরতম,
তোমারে চিনিনু চির-পরিচিত মম?

—০—

প্রেম।

নিবিড় তিমির নিশা অসীম কান্তার,
লক্ষ দিকে লক্ষজন হইতেছে পার।
অন্ধকারে অভিসার, কোন্ পথ পানে
কার তরে, পান্থ তাহা আপনি না জানে।
শুধু মনে হয় চিরজীবনের সুখ
এখনি দিবেক দেখা লয়ে হাসিমুখ।

কত স্পর্শ কত গন্ধ কত শব্দ গান,
কাছ দিয়ে চলে যায় শিহরিয়া প্রাণ !
দৈবযোগে ঝলি' উঠে বিদ্যুতের আলো,
যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভাল ;
তাহারে ডাকিয়া বলি—ধন্য এ জীবন,
তোমারি লাগিয়া মোর এতেক ভ্রমণ !
অন্ধকারে আর সবে আসে যায় কাছে,
জানিতে পারিনে তারা আছে কি না আছে।

—০—

পুঁটু।

চৈত্রের মধ্যাহ্নবেলা কাটিতে না চাহে।
তৃষাতুরা বসুন্ধরা দিবসের দাহে।
হেনকালে শুনিলাম বাহিরে কোথায়
কে ডাকিল দূর হ'তে—"পুঁটুরাণী আয়।"
জনশূন্য নদীতটে তপ্ত দ্বিপ্রহরে
কৌতূহল জাগি উঠে স্নেহকণ্ঠস্বরে।
গ্রন্থখানি বন্ধ করি' উঠিলাম ধীরে,
দুয়ার করিয়া ফাঁক দেখিনু বাহিরে।
মহিষ বৃহৎকায় কাদামাখা গায়ে
স্নিগ্ধনেত্রে নদীতীরে রয়েছে দাঁড়ায়ে।

যুবক নামিয়া জলে ডাকিছে তাহায়
স্নান করাবার তরে "পুঁটুরাণী আয়।"
হেরি সে যুবারে, হেরি পুঁটুরাণী তারি
মিশিল কৌতুকে মোর স্নিগ্ধ সুধাবারি।

—:—

হৃদয়-ধর্ম্ম।

হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায়,
জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়।
মাঝে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত যার
সে চাহে করিতে মগ্ন লুপ্ত একাকার।
মধ্যদিনে দগ্ধ দেহে ঝাঁপ দিয়ে নীরে
মা বলে' সে ডেকে ওঠে স্নিগ্ধ তটিনীরে।
যে চাঁদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উঁকি,
সে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু সুধামুখী।
যে সকল তরুলতা রচি' উপবন
গৃহপার্শ্বে বাড়িয়াছে, তারা ভাই বোন।
যে পশুরে জন্ম হ'তে আপনার জানি
হৃদয় আপনি তারে ডাকে পুঁটুরাণী।
বুদ্ধি শুনে হেসে ওঠে, বলে, কি মূঢ়তা
হৃদয় লজ্জায় ঢাকে হৃদয়ের কথা!

মিলন-দৃশ্য ।

হেসোনা হেসোনা তুমি, বুদ্ধি-অভিমানী,
একবার মনে আন, ওগো ভেদজ্ঞানী,
সে মহাদিনের কথা, যবে শকুন্তলা
বিদায় লইতেছিল স্বজন-বৎসলা
জন্ম তপোবন হ'তে,—সখা সহকার,
লতা ভগ্নী মাধবিকা, পশু-পরিবার,
মাতৃহারা মৃগশিশু, মৃগী গর্ভবতী,
দাঁড়াইল চারিদিকে,—স্নেহের মিনতি
গুঞ্জরি' উঠিল কাঁদি পল্লব মর্ম্মরে,
ছল ছল মালিনীর জলকলস্বরে ;—
ধ্বনিল তাহারি মাঝে বৃদ্ধ তপস্বীর
মঙ্গল বিদায় মন্ত্র গদগদ-গম্ভীর !
তরুলতা পশুপক্ষী নদনদীবন
নরনারী সবে মিলি' করুণ মিলন !

—০—

দুই বন্ধু ।

মূঢ় পশু ভাষাহীন নির্ব্বাক্ হৃদয়,
তার সাথে মানবের কোথা পরিচয় !

কোন্ আদি স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রভাতে
হৃদয়ে হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে
পথচিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চিরদিনে
লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দোঁহে চিনে।
সে দিনের আত্মীয়তা গেছে বহুদূরে ;—
তবুও সহসা কোন্ কথাহীন সুরে
পরাণে জাগিয়া উঠে ক্ষীণ পূর্ব্বস্মৃতি,
অন্তরে উচ্ছলি' উঠে সুধাময়ী প্রীতি,
মুগ্ধ মূঢ় স্নিগ্ধ চোখে পশু চাহে মুখে,—
মানুষ তাহারে হেরে স্নেহের কৌতুকে।
যেন দুই ছদ্মবেশে দু' বন্ধুর মেলা,—
তার পরে দুই জীবে অপরূপ খেলা!

—০—

সঙ্গী।

আরেক দিনের কথা পড়ি গেল মনে।
একদা মাঠের ধারে শ্যাম তৃণাসনে
একটি বেদের মেয়ে অপরাহ্ণ বেলা
কবরী বাঁধিতেছিল বসিয়া একেলা।
পালিত কুকুর শিশু আসিয়া পিছনে
কেশের চাঞ্চল্য হেরি খেলা ভাবি মনে

লাফায়ে লাফায়ে উচ্চে করিয়া চীৎকার
দংশিতে লাগিল তার বেণী বারম্বার।
বালিকা ভর্ৎসিল তারে গ্রীবাটি নাড়িয়া,
খেলার উৎসাহ তাহে উঠিল বাড়িয়া।
বালিকা মারিল তারে তুলিয়া তর্জ্জনী,—
দ্বিগুণ উঠিল মেতে খেলা মনে গণি'।
তখন হাসিয়া উঠি লয়ে বক্ষ পরে
বালিকা বাঁধিল তারে আদরে আদরে।

—০—

সুখদুঃখ।

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা।
সকাল থেকে বাদল হ'ল
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজ্‌কে দিনের মেলামেশা,
যত খুসি, যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি!
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি!

বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে!
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে!

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায়রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাইরে দুঃখ উহার মত,
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি'!
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ!
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

—o—

নগর-সংগীত।

কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত
নব নির্ম্মল শ্যামলকান্ত
উজ্জ্বলনীল বসনপ্রান্ত
সুন্দর শুভ ধরণী!
আকাশ আলোক-পুলকপুঞ্জ,
ছায়াসুশীতল নিভৃত কুঞ্জ,
কোথা সে গভীর ভ্রমরগুঞ্জ,
কোথা নিয়ে এল তরণী!
ওই রে নগরী জনতারণ্য,
শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য,
কতই বিপণি, কতই পণ্য
কত কোলাহল কাকলি!
কত না অর্থ, কত অনর্থ
আবিল করিছে স্বর্গমর্ত্ত্য,
তপন-তপ্ত ধূলি আবর্ত্ত
উঠিছে শূন্য আকুলি।
সকলি ক্ষণিক, খণ্ড, ছিন্ন,
পশ্চাতে কিছু রাখে না চিহ্ন,

পলকে মিলিছে, পলকে ভিন্ন,
ছুটিছে মৃত্যু-পাথারে।
করুণ রোদন, কঠিন হাস্য,
প্রভূত দম্ভ, বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য,
চলিছে কাতারে কাতারে।
স্থির নহে কিছু নিমেষ মাত্র,
চাহেনাক পিছু প্রবাসযাত্র,
বিরাম-বিহীন দিবসরাত্র,
চলিছে আঁধারে আলোকে
কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য
স্বর্ণ-ঝলকে করিছে নৃত্য,
তাহারে বাঁধিতে লোলুপ-চিত্ত
ছুটিছে বৃদ্ধ বালকে।
এ যেন বিপুল যজ্ঞকুণ্ড,
আকাশে আলোড়ি' শিখার শুণ্ড
হোমের অগ্নি মেলিছে তুণ্ড
ক্ষুধার দহন জ্বালিয়া।
নরনারী সবে আনিয়া তূর্ণ,
প্রাণের পাত্র করিয়া চূর্ণ

বহ্নির মুখে দিতেছে পূর্ণ
জীবন আহুতি ঢালিয়া।
হে নগরী, তব ফেনিল মদ্য
উছলি' উছলি' পড়িছে সদ্য,
আমি তাহা পান করিব অদ্য,
বিস্মৃত হব আপনা!
অয়ি মানবের পাষাণী-ধাত্রী,
আমি হব তব মেলার যাত্রী,
সুপ্তি-বিহীন মত্তরাত্রি
জাগরণে করি' যাপনা!
ঘূর্ণাচক্র জনতা-সংঘ,
বন্ধনহীন মহা আসঙ্গ,
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ
আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ,
পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।
নব নব খেলা খেলে অদৃষ্ট,
কখনো ইষ্ট, কভু অনিষ্ট,

কখনো তিক্ত, কখনো মিষ্ট,
যখন যা' দেয় তুলিয়া।
সুখের দুখের চক্রমধ্যে
কখনো উঠিব উধাও পদ্যে,
কখনো লুটিব গভীর গদ্যে,
নাগর-দোলায় দুলিয়া।
হাতে তুলি লব বিজয়-বাদ্য,
আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য,
যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য
তাহারে ধরিব সবলে!
আমি নির্ম্মম, আমি নৃশংস,
সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ
তুলিব আপন কবলে।
মনেতে জানিব সকল পৃথ্বী
আমারি চরণ-আসন-ভিত্তি,
রাজার রাজ্য, দস্যুবৃত্তি,
কোন ভেদ নাহি উভয়ে
ধন-সম্পদ করিব নস্ত,
লুণ্ঠন করি আনিব শস্ত,

অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব
ছুটাব বিশ্বে অভয়ে !
নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা,
নিত্য-নূতন কর্ম্মনিষ্ঠা,
জীবন-গ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা
উলটিয়া যাব ত্বরিতে।
জটিল কুটিল চলেছে পন্থ,
নাহি তার আদি, নাহিক অন্ত,
উদ্দামবেগে ধাই তুরন্ত,
সিন্ধু শৈল সরিতে ;
শুধু সম্মুখ চলেছি লক্ষ্যি'
আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী,
তুমিও ছুটিছ চপলা লক্ষ্মী
আলেয়া-হাস্তে ধাঁধিয়া ;
পূজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা,
বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা,
আনিব তোমারে বাঁধিয়া !
মানব-জন্ম নহে ত নিত্য
ধনজনমান খ্যাতি ও বিত্ত

নহে তারা কারো অধীন ভৃত্য,
কাল-নদী ধায় অধীরা !
তবে দাও ঢালি',—কেবলমাত্র
দু' চারি দিবস, দু' চার রাত্র,—
পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র
জন-সংঘাত মদিরা !

—০—

বিরহীর পত্র।

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
দূরে গেলে এই মনে হয় ;
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
জেগে থাকে সতত সংশয়।
এত লোক, এত জন, এত পথ, গলি,
এমন বিপুল এ সংসার,
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি
ছাড়া পেলে কে আর কাহার।

নিমেষের অন্তরালে কি আছে কে জানে,
নিমেষে অসীম পড়ে ঢাকা—

অন্ধ কাল-তুরঙ্গম রাশ নাহি মানে
বেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা।
কাছে কাছে পাছে পাছে চলিবারে চাই
জেগে জেগে দিতেছি পাহারা,
একটু এসেছে ঘুম—চমকি তাকাই
গেছে চলে কোথায় কাহারা!

ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কাঁদি তাই একা
বিরহের সমুদ্রের তীরে।
অনন্তের মাঝখানে দু'দণ্ডের দেখা
তাও কেন রাহু এসে ঘিরে।
মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়
পাঠায় সে বিরহের চর।
সকলেই চলে যাবে পড়ে' রবে হায়
ধরণীর শূন্য খেলাঘর।

গ্রহ তারা ধূমকেতু কত রবি শশী
শূন্য-ঘেরি জগতের ভীড়,
তারি মাঝে যদি ভাঙে, যদি যায় খসি'
আমাদের দু'দণ্ডের নীড়,—

কোথায় কে হারাইব—কোন্ রাত্রিবেলা
কে কোথায় হইব অতিথি।
তখন কি মনে রবে দুদিনের খেলা
দরশের পরশের স্মৃতি!

তাই মনে করে' কি রে চোকে জল আসে
একটুকু চোকের আড়ালে!
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভাল বাসে
সেও কি রবে না এক কালে।
আশা নিয়ে এ কি শুধু খেলাই কেবল—
সুখ দুঃখ মনের বিকার!
ভালবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল,
চায়, পায়, হারায় আবার।



পত্রের প্রত্যাশা।

চিঠি কই!—দিন গেল, বইগুলো ছুঁড়ে' ফেল
আর ত লাগে না ভাল ছাই পাঁশ পড়া!
মিটায়ে মনের খেদ গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ
পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদ মিছে মনগড়া!

কাননপ্রান্তের কাছে ছায়া পড়ে গাছে গাছে,
ম্লান আলো শুয়ে আছে বালুকার তীরে।
বায়ু উঠে ঢেউ তুলি,' টলমল পড়ে ঢুলি'
কূলে বাঁধা নৌকাগুলি জাহ্নবীর নীরে।

চিঠি কই! হেথা এসে একা বসে' দূর দেশে
কি পড়িব দিনশেষে সন্ধ্যার আলোকে!
গোধূলির ছায়াতলে কে বল গো মায়াবলে
সেই মুখ অশ্রুজলে এঁকে দেবে চোখে!
গভীর গুঞ্জন-স্বনে ঝিল্লিরব উঠে বনে,
কে মিশাবে তারি সনে স্মৃতি-কণ্ঠস্বর!
তীরতরু ছায়ে ছায়ে কোমল সন্ধ্যার বায়ে
কে আনিয়া দিবে গায়ে সুকোমল কর!

পাখী তরুশিরে আসে, দূর হতে নীড়ে আসে,
তরীগুলি তীরে আসে, ফিরে আসে সবে,
তার সেই স্নেহস্বর ভেদি' দূর দূরান্তর
কেন এ কোলের পর আসে না নীরবে!
দিনান্তে স্নেহের স্মৃতি একবার আসে নিতি,
কলরবভরা প্রীতি লয়ে' তার মুখে,

দিবসের ভার যত তবে হয় অপগত
নিশি নিমেষের মত কাটে স্বপ্নসুখে।

সকলি ত মনে আছে, যত দিন ছিল কাছে
কত কথা বলিয়াছে কত ভালবেসে,
কত কথা শুনি নাই, হৃদয়ে পায়নি ঠাঁই,
মুহূর্ত্ত শুনিয়া তাই ভুলেছি নিমেষে।
পাতা পোরাবার ছলে আজ সে যা' কিছু বলে
তাই শুনে মন গলে চোখে আসে জল,
তারি লাগি কত ব্যথা, কত মনোব্যাকুলতা,
দু চারিটী তুচ্ছ কথা জীবনসম্বল!

দিবা যেন আলোহীনা এই দুটিকথা বিনা
"তুমি ভাল আছ কি না" "আমি ভাল আছি।"
স্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে',
দুটি কথা দূরে থেকে করে কাছাকাছি।
দরশ পরশ যত সকল বন্ধন গত
মাঝে ব্যবধান কত নদী গিরি পারে,—
স্মৃতি শুধু স্নেহ বয়ে দুঁহু করস্পর্শ লয়ে'
অক্ষরের মালা হয়ে' বাঁধে দু'জনারে।

কই চিঠি! এল নিশা, তিমিরে ডুবিল দিশা,
সারা দিবসের তৃষা রয়ে' গেল মনে।
অন্ধকার নদীতীরে বেড়াতেছি ফিরে ফিরে,
প্রকৃতির শান্তি ধীরে পশিছে জীবনে।
ক্রমে আঁখি ছলছল, দুটি ফোঁটা অশ্রুজল
ভিজায় কপোলতল, শুকায় বাতাসে।
ক্রমে অশ্রু নাহি বয়, ললাট শীতল হয়
রজনীর শান্তিময় শীতল নিঃশ্বাসে।

—০—

বাসনার ফাঁদ।

যারে চাই, তার কাছে আমি দিই ধরা,
সে আমার না হইতে আমি হই তার!
পেয়েছি বলিয়ে মিছে অভিমান করা,
অন্যেরে বাঁধিতে গিয়ে বন্ধন আমার!
নিরখিয়া দ্বারমুক্ত সাধের ভাণ্ডার
দুই হাতে লুটে নিই রত্ন ভূরি ভূরি,
নিয়ে যাব মনে করি, ভারে চলা ভার,
চোরা দ্রব্য বোঝা হয়ে চোরে করে চুরি!
চিরদিন ধরণীর কাছে ঋণ চাই,
পথের সম্বল বলে জমাইয়া রাখি,

আপনারে বাঁধা রাখি সেটা ভুলে যাই,
পাথেয় লইয়া শেষে কারাগারে থাকি !
বাসনার বোঝা লয়ে ডোবে ডোবে তরী,
ফেলিতে সরে না মন, উপায় কি করি !



১ম ভাগ, ২য় খণ্ড।

বর্ণানুক্রম সূচী।

—০—